২০৩০ সালের একদিন ও অন্যান্য

সূচি

একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা
এই যুদ্ধে জয়ী হতে চাই
একি অপরূপ রূপে মা তোমায়
শূন্য দিয়ে গুণ
সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেবল এবং অন্যান্য মিথ
রাজনীতিতে নীতি ফিরে পেতে চাই
উল্লাস কিংবা ক্রোধ নয়– কষ্ট
আহমদ ছফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার
প্রিয় আহীর আলম
জয় হোক গণতন্ত্রের– জয় হোক বাংলাদেশের
'সংখ্যালঘু' নয়– বাংলাদেশের নাগরিক
স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন
চাই অসাম্প্রদায়িক নতুন প্রজন্ম
অন্যরকম বিজয় দিবস
২০৩০ সালের একদিন

একুশে টেলিভিশন এবং হিন্দি সিনেমা

১.

সকালবেলা একটা টেলিফোন এসেছে। যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি জানতে চাইলেন একুশে টেলিভিশনে এবারে ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানো হচ্ছে, আমি ব্যাপারটি জানি কি না। আমি জানতাম না, কাজেই টেলিফোনে তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন তৃতীয় দিন রাত সোয়া ৮টায় দেখানো হবে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে' এবং চতুর্থ দিন বিকেল ২টায় 'কুরবানি'। আমি হিন্দি ছবি সম্পর্কে কিছুই জানি না, চিত্রতারকাদেরও চিনি না। যিনি ফোন করেছেন তিনি জানালেন, ছবিগুলো বাণিজ্যিক ছবি।

টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমার মন খারাপ হয়ে আছে। অনেকদিন আমার এ রকম মন খারাপ হয়নি। ধর্মান্ধ গোষ্ঠী যখন মসজিদে একজন পুলিশকে খুন করে ফেলে তখন মন খারাপ হয় না, অসহ্য ক্রোধে শরীর কাঁপতে থাকে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সরকার যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নামটিকে স্মরণীয় করার ব্যাপারে সরাসরি বাধা দেয় তখন মন খারাপ হয়।

বাংলাদেশের জন্মের একেবারে গোড়ার ব্যাপারটি, আমাদের সেই ভাষা আন্দোলনের তারিখটি বুকে ধারণ করে যে টেলিভিশন চ্যানেলটি আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই চ্যানেলটি যখন এই দেশে হিন্দি কালচারকে বানের জলের মতো ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্যে ফ্লাড গেটটি খুলে দিতে উদ্যত হয়েছে তখন মন খারাপ তো হতেই পারে। আমার খুব মন খারাপ।

২.

আমার খুব বেশি টেলিভিশন দেখা হয় না। কিন্তু একটা দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে টেলিভিশনের গুরুত্ব-যে কত বেশি আমি সেটা কখনো অস্বীকার করি না। টেলিভিশনে খুব সুন্দর নাটক দেখিয়েছে বা খুব চমৎকার অনুষ্ঠান হয়েছে শুনলে আমার খুব আনন্দ হয়। একুশে টেলিভিশনে খুব চমৎকার খবর পরিবেশন করা হয় শুনে আমি আগ্রহ নিয়ে এক-দুইদিন তাদের খবর দেখেছি। আমিও তাদের, খবর পরিবেশন দেখে আনন্দ পেয়েছি। বিটিভির মন্ত্রীদের খবরে এখন যে আর কারো কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ থাকবে না, সে ব্যাপারেও আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি।

আমি নিজেও একুশে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। বাংলাদেশের স্বনামধন্য নাট্য ব্যক্তিত্ব আলী যাকেরের 'সরাসরি' অনুষ্ঠানে আমি সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা বলেছি। আমি নিজে সেটি দেখতে পারিনি, ধারণা ছিল অন্যেরাও সেটি দেখবে না। আমার আঞ্চলিকতাদুষ্ট উচ্চারণে টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কথা শুনতে কার ভালো লাগবে? কিন্তু অনেকে সেটি দেখেছেন, এখনও মাঝে মাঝে লোকজন আমাকে পথেঘাটে থামিয়ে বলে, আপনার অমুক কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। একুশে

টেলিভিশনের কল্যাণে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং ভাবনার কথা কত মানুষকে শোনাতে পেরেছি! বাংলাদেশের সাহসী সাংবাদিক আবেদ খানের একটি অনুষ্ঠানেও আমি ছিলাম, সেখানে তথ্য-প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলেছি। ছোট ছোট বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠানেও আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আমার লেখা 'বুবুনের বাবা' বইটিকে আমি নিজের হাতে নাট্যরূপ দিয়েছি, বাংলাদেশের সৃজনশীল চিত্রপরিচালক মোরশেদুল ইসলাম সেটাকে টেলিভিশনের সিরিজ করেছেন। এটিও আমি নিজে দেখতে পারিনি কিন্তু এ দেশের বাচ্চারা দেখেছে! আমার 'হাত-কাটা রবিন' বইটিকেও নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ভূতের নাটক হিসেবে একুশে টিভির পক্ষ থেকে আমার লেখা 'প্রেত' বইটির নাট্যরূপ দেওয়া হচ্ছে, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে এর জন্যে সময় দিচ্ছি। টেলিভিশনে জমাট একটা ভৌতিক কাহিনী খুব চমৎকার একটি ব্যাপার।

বাংলাদেশের সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারে– এ রকম একটি টিভি চ্যানেল ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, দেখে আমার ভালো লাগে, আমার গর্ব হয়। আমার পক্ষ থেকে যদি কিছু করার থাকে আমি সেটা করার চেষ্টা করি। একুশের ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিটুকু বুকে ধারণ করে যে টিভি চ্যানেল সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যে বুকে যদি মমতা না থাকে তাহলে কার জন্যে থাকবে?

৩.

ঈদ উপলক্ষে সেই একুশে চ্যানেলে হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে শুনে আমি একেবারে হতবাক হয়ে গেছি। দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানগত সাহায্য ছাড়াই হিন্দি আমাদের কালচারে অনুপ্রবেশ করে গেছে। এখন আমাদের সময় এসেছে নিজের কালচারটিকে বিকশিত করে বাইরের কালচারের মুখোমুখি হওয়ার। ঠিক সেই সময় যদি বাংলাদেশের একটি টিভি চ্যানেল সরাসরি হিন্দি ছবি দেখানো শুরু করে, সেটি যে আমাদের ওপর কত বড় একটি আঘাত তা কি কেউ চিন্তা করে দেখেনি? আমি নিশ্চিত, কালচারের বিশ্বায়ন বা অর্থনীতির বড় বড় কথা বলে এটাকে গ্রহণযোগ্য দেখানোর সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো সম্ভব, কিন্তু আমরা যারা বাংলাদেশে থাকি তারা কি দেশের প্রকৃত অবস্থাটি জানি না?

হিন্দি কালচার আমাদের গ্রাস করে ফেলেছে, ঢাকা-সিলেট প্রাইভেট ট্রেনটিতেও আজকাল হিন্দি গান শোনানো হয়। হিন্দি পড়তে পারে না বলে এখনও হিন্দি ম্যাগাজিন আসতে শুরু করে নি কিন্তু হিন্দিতে দেখা ও শোনার যত বিষয় আছে সেগুলো কি আমাদের নিজের কালচারকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলছে না? ঈদ উপলক্ষে হিন্দি সিনেমা দেখানোর আয়োজন করে একুশে টিভি প্রকাশ্যে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দি কালচারকে আমাদের দেশীয় কালচারের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলেন। এটি হচ্ছে শুরু, এর শেষ কোথায় হবে আমি কল্পনাও করতে চাই না কারণ আমার এক ধরনের আতঙ্ক হয়। এখন এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হবে কার থেকে বেশি কে হিন্দি সিনেমা দেখাতে পারে। স্পন্সররা বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে তৈরি থাকবেন, প্রতিদিন হিন্দি সিনেমা দেখানো হবে। আগে শুধু মাত্র ডিশ অ্যান্টেনা এবং কেবল

টিভির সঙ্গে যুক্ত দর্শকেরা হিন্দি ছবি দেখতেন, এখন সারা বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জের পথেঘাটের মানুষ এই হিন্দি ছবি দেখবেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এর থেকে বড় উদাহরণ আমার জানা নেই।

আমি কখনো বলিনি আমরা কূপমণ্ডুকের মতো থাকব, বাইরের কিছু দেখব না। আমরা অবশ্যি হিন্দি ছবি দেখব– ঠিক যেরকম চেক ছবি, ফরাসি ছবি, ইতালীয় ছবি দেখব, সেরকম হিন্দি ছবিও দেখব। পৃথিবীর নানা দেশের নানা কালচারের সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো আমাদের উপহার দেওয়া হোক– আমরা আগ্রহ নিয়ে দেখব, পৃথিবীর সৌন্দর্যে নিজেদের সম্পৃক্ত করব, নিজেদের বিকশিত করব। কিন্তু তাই বলে ঈদ উপলক্ষে নাম উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যায়, সেরকম একটি ছবি একুশের মতো বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যটিকে নামের মাঝে ধারণ করে রাখা একটি চ্যানেলে দেখানো হবে, সেটি তো আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না।

৪.

কাজেই একুশে টিভির কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, ঈদ উপলক্ষে হিন্দি ছবি দেখানোর যে ঘোষণাটি আপনারা দিয়েছেন সেটি প্রত্যাহার করুন। আপনারা হিন্দি ছবি না দেখিয়ে সেখানে বাংলা কোনো অনুষ্ঠান দেখান। একুশে টিভি একটি অত্যন্ত বড় প্রতিষ্ঠান, এই দেশের অত্যন্ত বড় বড় ব্যাপারে আপনারা অবদান রাখতে পারেন। আপনারা বাংলাদেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন। আপনারা সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও বড় অবদান রাখতে পারেন। মফস্বলের একটি ছোট নাট্যগোষ্ঠী দেশের জন্য বা দেশের কালচারের জন্য গভীর মমতায় একটি নাটক করে অল্প কিছু মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে কিন্তু একুশে টিভির একটি অনুষ্ঠান এই দেশের কয়েক কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। আবার একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা দেশের কয়েক কোটি মানুষকে পিছিয়ে নিতে পারে, বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। কাজেই অনুগ্রহ করে আপনারা এত বড় একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না।

৫.

আমি নিশ্চিত এ দেশের অসংখ্য মানুষ আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমাদের কালচারে হিন্দি ছবি অনুপ্রবেশ করে গেছে, আমরা সেটা থামাতে পারিনি। কিন্তু একটা দেশের, সমাজের, সেই দেশের কালচারের একটা আত্মমর্যাদা থাকে, আমরা সেই আত্মমর্যাদাটুকু প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। এই দেশের গুণীজন, সংস্কৃতিবান লোকেরা, প্রযুক্তিবিদরা মিলে যে টেলিভিশন চ্যানেল দাঁড় করিয়েছেন তারা দেশের মূল সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে একাত্ম থাকবেন, আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করবেন, এটাই আমাদের স্বপ্ন। এর চাইতে বেশি কিছু নয়।

প্রথম আলো
২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

এই যুদ্ধে জয়ী হতে চাই

১.

তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আজকাল সবাই খুব ভাবনা-চিন্তা করছেন। সেদিন এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একজন হঠাৎ করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিলেন। তিনি বললেন, আমরা সবাই জানি তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে ভারত খুব এগিয়ে আছে। কিন্তু একটি ব্যাপার অনেকেই ভালো করে লক্ষ করেনি। এ ব্যাপারে সারা ভারত কিন্তু সমানভাবে এগিয়ে নেই। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে ভারতের এত বড় সুনাম কিন্তু ব্যাঙ্গালোর বা হায়দ্রাবাদ এ রকম দু-একটি অঞ্চলের জন্য, অন্য অঞ্চলগুলোর অবস্থা অনেকটা আমাদের দেশের মতোই!

এরা কারণটা কী ? কারণটা খুবই সহজ। ভারতের যে অল্প দু-একটি অঞ্চল তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাদের শিক্ষার মান সারা ভারতের মাঝে সবচেয়ে সেরা। তাই তারা যে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে তাই নয়, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। পৃথিবীর সব দেশে এই অঞ্চলের মানুষকে পাওয়া যাবে সেরা বিজ্ঞানী, সেরা ডাক্তার বা সেরা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে বড় অবদান রাখার জন্য তারা ট্রেনিং সেন্টার খুলে রাতারাতি সবাইকে ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করেনি। শিক্ষার ব্যাপারে এদের পাঁচ-দশ বছরের ঐতিহ্য নয়, তাদের ঐতিহ্য শত শত বছরের। কাজেই এই মেধাবী সৃজনশীল তরুণ প্রজন্ম যখন তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগটি পেয়েছে, তারা আশ্চর্য ক্ষীপ্রতায় সেটি লুফে নিয়েছে। ব্যাপারটির গুরুত্বটুকু পুরোপুরি বোঝার পরও অন্যরা সেটা এখনো গ্রহণ করতে পারেনি, শুধু চেষ্টাই করে যাচ্ছে।

২.

ভারতের উদাহরণটুকু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে একটি জিনিস দেখিয়ে দিচ্ছে। সেটি হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারের কালচার নিয়ে দেশের শিক্ষা হয় না, একটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে দরকার দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, দীর্ঘদিনের চেষ্টা। আমাদের দেশে কি সে রকম দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিশ্রম বা চেষ্টা রয়েছে? আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, সে রকম কোনো প্রচেষ্টা দূরে থাকুক, পড়াশোনার ব্যাপারটির যে আদৌ কোনো গুরুত্ব আছে সেটিও এখনো এই দেশের হর্তাকর্তা-বিধাতারা ধরতে পারেননি। যারা আমার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন, তাদের আমি কয়েকটা ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিই।

আমাদের দেশে কোনো শিক্ষানীতি ছিল না। কাজেই যার যেভাবে খুশি সেভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে যেত। তালেবানি কায়দায় মসজিদে মানুষ খুনের শিক্ষা থেকে শুরু করে পুরোপুরি পাশ্চাত্য কালচার, দেশের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কহীন ইংরেজি শিক্ষা (যেখানে মি. স্মিথ পাউণ্ড, শিলিং, পেন্স খরচ করে পিকাডেলি সার্কাসে ফিশ

অ্যাণ্ড চিপস ক্রয় করেন) নামের এক ধরনের রমরমা ব্যবসা চলত। কাজেই শেষ পর্যন্ত যখন এ দেশে শিক্ষানীতি তৈরি করার জন্য শিক্ষাবিদদের দায়িত্ব দেওয়া হলো, আমরা খুব আহ্লাদিত হয়েছিলাম। আমার মনে আছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো দুদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওয়ার্কশপ করে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিটির একটি একটি লাইন করে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। আমাদের সুপারিশগুলো আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে সংসদীয় কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেই শিক্ষানীতিটি যখন জাতীয় সংসদে পাস হলো তখন শিক্ষানীতি কমিটির সভাপতি বললেন, এটি কী বস্তু ? আমরা তো এই শিক্ষানীতি তৈরি করিনি!

এর চেয়ে বড় এবং উৎকট রসিকতা কী হতে পারে ? জাতীয় সংসদে যে শিক্ষানীতিটি পাস করা হয়েছে সেখানে কী রয়েছে ? আমি এক ধরনের আতঙ্ক নিয়ে সেটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। এখনো সেটি খুঁজে পাইনি। যারা দেখেছেন তারা বলেছেন শিক্ষানীতির এক জায়গায় রয়েছে, 'যারা দরিদ্র তারা ভোকেশনাল ট্রেনিং নেবে।' স্বাধীনতার পরপর আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি, যেকোনো হিসাবে আমি তখন দরিদ্র। প্রাইভেট টিউশানি করে, পত্রিকায় কার্টুন এঁকে, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করে নিজের খরচ চালিয়েছি, পরিবারকে সাহায্য করেছি। এই শিক্ষানীতি চালু থাকলে শুধু দরিদ্র হওয়ার অপরাধে আমাকে হয়তো ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন দেখার অধিকার কেড়ে নিয়ে একটি ভোকেশনাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হতো।

দরিদ্র দেশের নানা সমস্যা থাকে, নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা তাকে, কিন্তু সেজন্য তো আর নীতিটি ক্ষুদ্র হতে পারে না। নীতিটি হতে হবে আকাশছোঁয়া উদার এবং মহৎ। ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ তো শিক্ষানীতি করতে পারে না।

এ বছর পাঠ্যবই নিয়ে একটা বড় ধরনের কেলেঙ্কারি হলো। শিক্ষাবর্ষের দু-তিন মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাজারে পাঠ্যবইয়ের দেখা নেই। পত্রপত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে অনেক লেখালেখি হলো। আমি ব্যাপারটি খুব ভালো করে জানি, কারণ এ বছর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা স্কুল চালু করা হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই বেছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের কয়েকজনের ওপর। বইয়ের দোকানে হাঁটাহাঁটি করে আমরা আবিষ্কার করেছি খবরের কাগজে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই, সত্যি সত্যি পাঠ্যবই পাওয়া যাচ্ছে না।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো জাতীয় সংসদে, যেখানে সরকারি দলের কয়েকজন সাংসদ মিনমিন করে ব্যাপারটি উত্থাপন করার চেষ্টা করলেন এবং প্রধানমন্ত্রী এক ধমক দিয়ে তাদের বলে দিলেন যে দেশে বইয়ের কোনো অভাব নেই, পুরোটাই একটা বানোয়াট গল্প।

সময়মতো বই ছাপাতে না পারাটি আমাকে খুব বিস্মিত বা আতঙ্কিত করে না। দরিদ্র দেশে নানা ধরনের সমস্যা থাকে, দেশকে সেই সমস্যা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। অনেক সময় বিদঘুটে সব সমস্যার অভাবনীয় সব সমাধান বের হয়ে যায়। কিন্তু তার পূর্বশর্ত হচ্ছে সমস্যাটির কথা জানতে হয়। এবারের বই সমস্যার কোনো সমাধান হলো না, কারণ দেশের সবচেয়ে ওপরের মহল এই সমস্যাটির অস্তিত্ব চোখ খুলে

দেখতে চাইলেন না। যে ব্যাপারটিতে এ দেশের কোটি কোটি ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ জড়িত, সেই ব্যাপারটিকে জাতীয় সংসদের একজন মানুষও গুরুত্ব দিতে রাজি হলো না, এই দুঃখটি আমরা কোথায় রাখি। এ দেশের সরকার যদি দেশের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারটিকে এতটুকু গুরুত্ব দিতেন, তাহলে কি এ ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে পারত?

মার্চ মাসের ১৫ তারিখ থেকে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই আমি একটি সেমিনারে বলেছিলাম যে, এ বছর নকলের সবচেয়ে বড় মহোৎসব হবে, কারণ এটি হচ্ছে নির্বাচনের বছর। নকল ব্যাপারটি এখন এক ধরনের সামাজিক অধিকারের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার্থী তার বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, তার স্কুলের শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং তার এলাকার রাজনৈতিক নেতারা সবাই এই সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে অংশ নেন, এই সামাজিক ব্যাপারটি থেকে সবারই কিছু না কিছু পাওয়ার আছে। নির্বাচনের বছরে এতদিনের 'ঐতিহ্য' এই সামাজিক অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেবে এত বড় ভুল তো সরকার করতে পারবে না। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আমার আশঙ্কা পুরোপুরি সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, সারা দেশে নকলের মহোৎসব চলছে।

একটি দেশে শিক্ষার মান বাড়াতে হলে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে কোনো প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একটি সিদ্ধান্তের। দেশের সবচেয়ে ওপরের মহল যদি সিদ্ধান্ত করত এ বছর কাউকে নকল করতে দেবে না, তারপর কয়েক দিনের জন্য দেশের মিলিটারি, বিডিআরকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কিছু ভারী অস্ত্রহাতে বসিয়ে দিত, তাহলে কি নকলে সাহায্য করার জন্য বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতারা এগিয়ে আসতে সাহস পেত? দেশে বন্যার সময় সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়, এমনকি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়, তার তুলনায় এটা কি আরো শত গুণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়?

পড়াশোনা বা ছাত্রছাত্রী বলতে কী বোঝায়, সে সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের যে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই সেটি আবার নতুন করে প্রমাণ করেছেন আমাদের বিরোধী দলের নেত্রী। এমনিতেই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা, ছাত্র বলতে এক ধরনের তরুণ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা মিটিং-মিছিল করে, ছাত্রসংসদে দলের ব্যানারে নির্বাচন করে এবং অস্ত্রপাতি হাতে নিয়ে আন্দোলন করে। তাদের পড়াশোনা করার একটি ব্যাপার থাকতে পারে, সেটি তারা আসলেই জানেন না। বিরোধী দলীয় নেত্রী যখন মধ্যবয়স্ক বিবাহিত, পুত্রসন্তানের জনক এক বিখ্যাত সন্ত্রাসীকে তাদের ছাত্রসংগঠনের সভাপতি করে দিলেন এবং সাংবাদিকরা সেটি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করলে তিনি কোনো রাখঢাক না রেখে একেবারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন, ছাত্ররাজনীতি করতে হলে তাকে ছাত্র হতে হয় কে বলেছে? এই কথাটি যে একটি অত্যন্ত আপত্তিকর কথা হতে পারে সেই ব্যাপারটিই তিনি জানেন না। এই রাজনৈতিক নেতারাই দেশের হর্তাকর্তা হয়ে যান! তখন তারা লেখাপড়ার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন, সেটা আমরা কেমন করে আশা করি?

৩.

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের পড়াশোনায় সবচেয়ে বড় যে সর্বনাশটি হয়েছে সেটি হচ্ছে সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দেওয়া। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এ দেশের রাজাকার আল-বদররা খুব হিসাব করে দেশের সকল বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করতে শুরু করেছিল, যেন আমরা জাতি হিসেবে কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারি। দেখেশুনে মনে হয় এখানেও ঠিক একই রকম ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের সৃজনশীলতা না শিখিয়ে মুখস্থ করতে শেখাচ্ছি যেন বড় হয়ে তারা কয়েকটা সার্টিফিকেটের মালিক হয় কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো কাজে না লাগে।

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ একটি জিনিস। বিজ্ঞানীরা এখনো সেটি নিয়ে গবেষণা করছেন, তারা দেখেছেন এর বিকাশের কিছু বিচিত্র নিয়মকানুন রয়েছে। যেমন জন্মের পর যদি কালো কাপড় দিয়ে একটা শিশুর চোখ বেঁধে দেওয়া হয় যেন সে দেখতে না পারে, এবং সেভাবে যদি বছরখানেক রেখে দেওয়া যায়, তাহলে সে জীবনে আর কখনোই দেখতে পাবে না। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু দেখার কাজে সাহায্য করে সেই অংশটুকু যদি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার না করা হয় তাহলে মস্তিষ্ক সেটাকে অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলে, পরবর্তী সময়ে দেখার কাজে ব্যবহার করতে চাইলেও সেটা ব্যবহার করা যায় না। মূক-বধির বাচ্চাদের হিয়ারিং এইড দেওয়ার বেলাতেও সেটা সত্যি। শিশু অবস্থায় দেওয়া না হলে সেটি কাজে লাগে না। নতুন ভাষা শেখার বেলাতেও দেখা গেছে ১০ বছর বয়সের আগে একটি শিশু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেটি শিখতে পারে, কিন্তু একটু বড় হয়ে গেলে সেটি পরিশ্রমের ব্যাপার। ঠিক এ রকম সৃজনশীলতা শেখারও বয়স রয়েছে। স্কুল-কলেজে সৃজনশীলতা যদি শিখতে না পারে, বড় হয়ে সেই শিশু কখনোই সত্যিকারের সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না। অথচ আমরা অবলীলায় আমাদের পুরো প্রজন্মকে সৃজনশীলতা থেকে ঠেলে দূরে সরিয়ে এনেছি, পড়াশোনার পুরো ব্যাপারটি এখন মুখস্থ করার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে।

মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত চমকপ্রদ কাজ করতে পারে কিন্তু যে কাজটি মোটেও ভালো করে করতে পারে না এবং ভালো করে করার কথাও নয়, সেটি হচ্ছে মুখস্থ করা। অথচ আমরা অনেক সময় পড়াশোনা করা এবং মুখস্থ করাকে সমার্থক বলে মনে করি। আমি খবরের কাগজে স্কুলের বিজ্ঞাপন দেখেছি, যেখানে স্কুলটি কত ভালো সেটি বোঝানোর জন্য বড় বড় করে লেখা হয়েছে, 'এখানে মুখস্থ করানোর ভালো ব্যবস্থা রয়েছে।' 'এখানে চুরি শেখানোর ভালো ব্যবস্থা আছে' লেখা থাকলেও আমি এত আতঙ্কিত হতাম না! সবচেয়ে ভয়ের কথা, যারা স্কুল পরিচালনা করেন, তারা জানেন পর্যন্ত না যে ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ করার কথা নয়। তাদের শেখার কথা, জানার কথা।

পড়াশোনা মুখস্থনির্ভর হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়েদের জীবন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের মস্তিষ্ক যেহেতু মুখস্থ করার জন্য তৈরি হয়নি, তাই সেটি করতে অনেক বেশি সময় নেয় এবং কাজটি অত্যন্ত কষ্টকর। আমাদের দেশের একটি ছেলে কিংবা মেয়ের দৈনন্দিন রুটিন দেখলে শিউরে উঠতে হয়, কারণ তারা

দিন-রাত পড়ছে। স্কুল থেকে আসার পর প্রাইভেট টিউটর, সেখান থেকে ব্যাচে পড়া, সেখান থেকে আবার অন্য একটি প্রাইভেট টিউটর এবং পুরো সময়টিতে শুধু মুখস্থ এবং মুখস্থ। এসএসসি পরীক্ষার পর কলেজে ঢোকার জন্য পড়া, এইচএসসি পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজে ঢোকার জন্য পড়া– কোথাও এক মুহূর্তের জন্য বিরতি নেই। এত বিশাল আয়োজন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে এইচএসসি নামক একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়, কিন্তু দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তার ফলাফলকে বিশ্বাস করতে রাজি নয়, তারা নিজেরা ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মেধা যাচাই করে নেয়। একটি দরিদ্র দেশের জন্য এটি কত বড় অপচয় কেউ ভেবে দেখেছে?

৪.

স্বাধীনতার পর ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। একটি দেশের জন্য ৩০ বছর দীর্ঘ সময় নয়, কিন্তু একজন মানুষের জীবনের জন্য সেটি অনেক দীর্ঘ। আমাদের প্রিয়জনরা এই দেশের জন্য রক্ত দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছিল, দেশটি যদি মাথা তুলে না দাঁড়ায় তাহলে সেই রক্তের ঋণ শোধ হবে না। আমরা আমাদের জীবদ্দশায় সেই রক্তের ঋণ শোধ করে যেতে চাই। সেটি শোধ করতে হলে আমাদের কোনো শর্টকাট নেই। যেভাবেই হোক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এই দেশের ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভর করছে এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর।

দেশের একটি ভয়ঙ্কর কুৎসিত শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর থেকেও সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মেধাবী ছেলেমেয়েরা বের হয়ে আসছে। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, এই ছেলেমেয়েরা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি অসম যুদ্ধ জয় করে আসছে, কিন্তু এটি তো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল না, তাদের পক্ষে যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল।

৩০ বছর আগে যেভাবে অস্ত্রহাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, এখন ঠিক সেভাবে আবার একটা নতুন যুদ্ধ করার সময় হয়েছে। কেউ যদি পড়াশোনার ব্যাপারটি একটি দায়সারা দায়িত্ব হিসেবে মনে করে তাহলে চলবে না। এ দেশের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সম্পদের সিংহভাগ শিক্ষার পেছনে ঢেলে দিতে হবে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেভাবে জীবন-মরণের প্রশ্ন চলে আসে আমাদের ঠিক সে রকম এখানেও জীবন-মরণের প্রস্তুতি নিতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো সম্ভব, এই কাজে সাহায্য করার জন্য দেশের অসংখ্য শিক্ষাবিদ প্রস্তুত।

এখন প্রয়োজন শুধু একটি সিদ্ধান্তের।

২৯ মার্চ, ২০০১

একি অপরূপ রূপে মা তোমায়

পহেলা বৈশাখ একটি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আমার খুলনার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়ার কথা। ভোর সাড়ে ৮টার সময় বাসে ওঠার ঠিক পূর্বমুহূর্তে খবর পেলাম, রমনার বটমূলে ছায়ানটের সঙ্গীতানুষ্ঠানে বোমা হামলায় আটজন মারা গেছে। আমার মেয়েটিকে আমি আসার রাতে বোনের বাসায় রেখে এসেছি, নববর্ষের ভোরবেলা বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা সবাই মিলে শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাবে, কী শাড়ি পরা হবে, কীভাবে সাজা হবে সেটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। তাদের সেই আনন্দ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে আটজনকে হত্যা করা হয়েছে শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল।

শুধু আমার নয়, ঢাকা শহর এমনকি বাংলাদেশের সবার বুক কেঁপে উঠেছিল। নববর্ষের ভোরবেলা রমনার বটমূলের অনুষ্ঠানটির মতো স্নিগ্ধ কোমল আনন্দময় কোনো অনুষ্ঠানের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। ঢাকা শহরের সব পরিবারের কেউ না কেউ সেখানে থাকে। উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা হামলার সময় মোটামুটিভাবে সবাই জানত কারা যশোরে গেছে, কারা বিপদগ্রস্ত হতে পারে। সিপিবি'র জনসভাতেও বোমা দিয়ে মারার বেলাতেও একই কথা, সভাটি রাজনৈতিক সভা, রাজনৈতিক কর্মীরাই সেখানে ছিলেন। কিন্তু রমনার বটমূলে বোমা হামলার ঘটনাটি অন্যরকম– এটি খবরের কাগজে দেখা বহু দূরের কোনো ঘটনা নয়, এটি ঢাকা শহরের এমনকি বাংলাদেশের সবার একেবারে কাছাকাছি ঘটনা। আমি এখনো একজন মানুষকেও পাইনি, যে সেদিন নিজের আপনজনের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়নি।

যাত্রায় বিরতি দিয়ে আমি এবং আমার সহকর্মী আমাদের সন্তানদের আপনজনের খোঁজ নিতে নিজে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম, তারা ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকলেও ভালো আছে। বোমা হামলায় কারা মারা গেছে তখনো জানি না। আমার বোনের মেয়েটি আকুল হয়ে কাঁদছে। সে ছায়ানটের ছাত্রী, সেখানে সবাই তার আপনজন। আমার মেয়েটি হতচকিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বু, যারা এভাবে বোমা মেরেছে তারা কী রকম মানুষ?'

আমি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। একটি আনন্দ অনুষ্ঠানে হাসিখুশি অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুর মাঝে প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা মেরে একেবারে নিরীহ কিছু মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলে যারা সম্ভবত একধরনের পৈশাচিক আনন্দ পায়– তারা কী রকম মানুষ কিংবা আদৌ মানুষ কি না আমি জানি না। অনেকে তাদের হিংস্র পশু থেকে অধম বলেছেন কিন্তু আমি জানি পৃথিবীতে কোনো পশু অকারণে নিজেদের এভাবে হত্যা করে না। তাদের পশুর সঙ্গে তুলনা করলে পশুদের অপমান করা হয়।

আমি আমাদের পরিবারের শিশুগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবার বাসে উঠেছি এবং তখন হঠাৎ করে বুঝতে পেরেছি, আমি যেভাবে আমার সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পেরেছি কোনো কোনো বাবা-মা আর কোনোদিন সেভাবে তাদের সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না। বাকি জীবন বুকের ভেতর এক ভয়ঙ্কর শূন্যতা নিয়ে কাটিয়ে দেবে। রেডিও-টেলিভিশন-খবরের কাগজে যে মৃত্যুকে বহুদূরে একটি জিনিস বলে মনে হতো, হঠাৎ করে সেটিকে খুব কাছের জিনিস মনে হলো। সারা দিন বাসে খুলনা যাওয়ার সময়

আমি আমার নিজের ভেতরে এক বিচিত্র ক্রোধ, ক্ষোভ ও ঘৃণা অনুভব করেছি। ঢাকা থেকে খুলনা দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে একটু পরে পরে দেখেছি বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, বৈশাখী মেলা। রাস্তার পাশে স্টেজে গান গাইছে, কবিতা পড়ছে. ছোট ছোট শিশু মায়ের হাত ধরে, বাবার কাঁধে চড়ে আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছে। এই হচ্ছে আমাদের, বাংলার আবহমান কালের সংস্কৃতি। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত এই সংস্কৃতিটুকু, এই ভালোবাসাটুকু যে এক শ্রেণীর মানুষ এত ভয় পায় যে, এই হিংস্র পাশবিকতা নিয়ে সেটাকে আঘাত করতে হবে, আমার জানা ছিল না।

কারা এটি করছে সে সম্পর্কে আবছা তথ্য বের হয়ে আসছে- কিন্তু সেটি অনুমান করা এতটুকু কঠিন ছিল না। তারা বহুদিন থেকে প্রকাশ্য জনসভায় বাঙালির সংস্কৃতিকে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করে আসছে। বাঙালির সূর্যসন্তানকে তারা প্রকাশ্যে হত্যা করার হুমকি দেয়, গোপনে তাদের হত্যা করা তাদের জন্য এমন কী কঠিন কাজ?

যারা এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের সবার সামনে, তাদের পরিচয় উন্মোচন করে কি বিচার করা হবে? আমার কেন জানি মনে হয়, শেষ পর্যন্ত বুঝি কিছু হবে না। যদি হতো তাহলে উদীচী হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো, সিপিবি জনসভায় হত্যাকাণ্ডের বিচার হতো। আমরা জানি কিছু হয়নি- কেন হয়নি তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আছে কিন্তু ফলাফল শূন্য। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সরকার অনেক বড় বড় এবং ভালো ভালো কথা বলেন কিন্তু আমার আজকাল সেগুলো সে রকম বিশ্বাস হয় না। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা থেকে জানি, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারও মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তারা বলেছেন, মুক্তিযোদ্ধার এক ভোট, সে রকম রাজাকারেরও এক ভোট। ভয়ঙ্কর একটি হত্যাকাণ্ডের মানবিক কষ্টটি তারা দেখতে পান না, ভোটের রাজনীতিতে কত কৌশলে তারা সেটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য- আমরা সব কটি রাজনৈতিক দলের ভেতরেই এটা দেখতে শুরু করেছি।

কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস হারাই না। রমনার বটমূলে এই নৃশংস ঘটনার পর বিএনপি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছে। আমরা কি আশা করতে পারি না দেশের বৃহত্তম দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি পাশাপাশি বসে এই ভয়ঙ্কর অপশক্তি, বিবেকহীন ধর্মান্ধ স্বাধীনতাবিরোধীদের চিরদিনের জন্য দেশছাড়া করে দেওয়ার পরিকল্পনা করবে? সেটা কি এতই অবাস্তব একটি কল্পনা? যতদিন সেটি না হচ্ছে, আমরা কী করতে পারি? আমার মনে হয়, এই হীন অপশক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে শক্তি সেটা আমাদের বুকের মাঝে সঞ্চয় করতে পারি। সেটি হচ্ছে দেশের জন্য ভালোবাসা, দেশের সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসা, অসাম্প্রদায়িক সমাজের জন্য ভালোবাসা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জন্য ভালোবাসা। ১৯৭১ সালে তাদের পূর্বসূরীরা এ দেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েও বুকের ভেতরকার ভালোবাসায় হাত দিতে পারেনি, এখন কেমন করে পারবে? দেশ, দেশের মানুষ দেশের সংস্কৃতির জন্য ভালোবাসার কী প্রচণ্ড শক্তি সেটি এই দানবরা কেমন করে জানবে? এই দেশের, দেশমাতৃকার অপরূপ রূপ তারা কোনোদিন দেখেনি, আমরা তো দেখেছি। রমনার বটমূলে যে গানটি মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, সারা দেশে যে সেটি একসঙ্গে বেজে উঠতে শুরু করেছে সেটা কি তারা জানে?

প্রথম আলো, ১৯ এপ্রিল, ২০০১

শূন্য দিয়ে গুণ

নতুন গুণ ভাগ করতে শিখেছে এ রকম ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে আমি এ রকম একটা অংক করতে দিই : ৭৪২×৩১×৪২৫×১৯×৩২২×০= ?

এই বিশাল অংক দেখে বাচ্চাকাচ্চারা সাধারণত চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। যারা একটু বুদ্ধিমান তারা অবশ্য একটু পরেই আবিষ্কার করে ফেলে, বড় বড় সংখ্যা দিয়ে গুণ করার পর গুণফল যাই হোক না কেন, শূন্য দিয়ে গুণ করার পর সেটা সব সময়ই শূন্য হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগের গত পাঁচ বছরের দেশ পরিচালনা দেখে আমার হঠাৎ করে এই ছেলেমানুষি অংকটার কথা মনে পড়ে গেল। শুধু মনে হচ্ছে তারা তাদের বিশাল বিশাল অর্জনকে শূন্য দিয়ে গুণ করে শেষ মুহূর্তে পুরোটাকে শূন্য করে ফেলতে উদ্যত হয়েছে।

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক বড় বড় অর্জন রয়েছে। আমার নিজের হিসাবে তার মাঝে সবচেয়ে বড় এবং মহৎ অর্জন হচ্ছে পার্বত্য শান্তিচুক্তি। যদিও আমরা ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছি এই চুক্তির সত্যিকার বাস্তবায়ন হচ্ছে না এবং নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তবুও আমি আশাবাদী। পার্বত্য এলাকার সংঘাতের কথা মনে হলেই আমার কেন জানি একাত্তরের কথা মনে পড়ে। একাত্তরে আমরা যেভাবে মারা গেছি ঠিক সেই একইভাবে পাহাড়ি মানুষ মারা যাচ্ছে আমাদের সেনাবাহিনীর হাতে- এত বড় অবিচার সবার চোখের আড়ালে ঘটে যাচ্ছিল সেটা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সরকার পুরোপুরি অর্থহীন সংঘাত শেষ করে একটা শান্তিচুক্তি করেছে, এর থেকে বড় ব্যাপার, মহৎ ব্যাপার আর কী হতে পারে?

আওয়ামী লীগ সরকারের আরো একটা বড় সাফল্য ছিল স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে বড় বন্যার পর সাধারণ মানুষের পুনর্বাসন। আমি নিজের কানে বিবিসি থেকে বলতে শুনেছি, এই বন্যার পর বাংলাদেশে কোটি খানেক মানুষ মারা যেতে পারে। কিন্তু আমরা সবাই জানি বন্যার কারণে না খেয়ে কোনো মানুষ মারা যায়নি। এত বড় একটা সাফল্যের কথা কিন্তু খুব বড় গলায় ফলাও করে কখনো বলা হয়নি। যে মানুষদের জীবন রক্ষা পেয়েছে তারা গরিব, দুস্থ অসহায় মানুষ বলেই কি তাদের জীবন রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারটিকে সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি?

কিছুদিন হলো বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, এটিও এই সরকারের একটি বিশাল অর্জন। এই দেশের জনসংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কিন্তু তার আয়তন যুক্তরাষ্ট্রের একটা ক্ষুদ্র স্টেটের সমান। আমার দীর্ঘ প্রবাস জীবনে যতবার এই তথ্যটি উঠে এসেছে ততবার আমার বিদেশী বন্ধুরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছে। এত ছোট জায়গায় কেমন করে এতগুলো মানুষ থাকে সেটিই তাদের

কাছে একটি রহস্য, এই ছোট জায়গাতেই যে এতগুলো মানুষের খাবার উৎপাদন করে ফেলা গেছে সেটি নিশ্চয়ই আরো বড় রহস্য। ঠিক ইচ্ছে থাকলে আমাদের দেশে যে ম্যাজিক করে ফেলা যায় এটি তার একটি বড় উদাহরণ এবং এই ম্যাজিক করে ফেলার জন্য জাতি নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ সরকার, কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বেগম মতিয়া চৌধুরীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

এছাড়াও সরকারের মস্ত বড় অর্জন হচ্ছে কুখ্যাত ইনডেমনিটি বিলটিকে সংবিধান থেকে দূর করে পুরো জাতিকে একটা অবমাননা থেকে রক্ষা করা। আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু এবং তার পরিবারের হত্যাকারীদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে প্রতিহিংসামূলকভাবে বিচার না করে তাদের যে প্রচলিত আইনে বিচার করা হয়েছে, সেটিও তাদের একটা মস্ত বড় কৃতিত্ব।

গঙ্গার পানি চুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বেসরকারি টিভি চ্যানেল এই ধরনের আরো বড় বড় কিছু সাফল্য রয়েছে, তবে আমার ব্যক্তিগত ফেবারিট হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ফিরিয়ে আনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে সরকারের আন্তরিক উৎসাহ। দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসে ৩০০ টাকা দেওয়াটি হয়তো তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করবে না, কিন্তু দেশ যে তাদের ভুলে যায়নি সেই অনুভূতির আবেদনটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের সমাহিত করার সিদ্ধান্তটিও একটি অপূর্ব সিদ্ধান্ত। আমি এই অত্যন্ত মানবিক সিদ্ধান্তটির জন্য এই সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

তথ্যপ্রযুক্তিকে বিকশিত করার জন্য সরকারের নানা প্রচেষ্টা চলছে এবং অল্প কিছুদিন হলো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির জন্য এখন যে বিনিয়োগ হচ্ছে তার ফল পেতে আর দু-এক বছর সময় নেবে, কিন্তু খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মতো তথ্যপ্রযুক্তির ফসলও যে আমরা কিছুদিনের মাঝে ঘরে তুলতে পারব সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আমি নিশ্চিত, একটু সময় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করলে এই সরকারের সাফল্যের লিস্টি আরো লম্বা করে ফেলা সম্ভব। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি সাধারণ একজন মানুষকে আওয়ামী লীগ সরকারের দেশ পরিচালনার কথা জিজ্ঞেস করা যায়, আমি বাজি ধরে বলতে পারি, সে তার সাফল্যের কোনো কথা বলবে না। সে বলবে এটি হচ্ছে সেই দল যে দল জয়নাল হাজারীর মতো একজন জাতীয় সন্ত্রাসী চরিত্রের সৃষ্টি করে, যে টিপু সুলতানের মতো একজন সাংবাদিককে নির্যাতন করে পঙ্গু করে ফেললেও কেউ তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না। সে নাইন গুটারের কথা বলবে, সাংসদ ইকবালের মিছিল থেকে সন্ত্রাসীদের গুলি করার কথা বলবে, স্বনামধন্য 'রাজপুত্র' এবং তাদের কীর্তিকলাপের কথা বলবে, সারা দেশে সরকারি দলের সমর্থকদের অত্যাচার, অনাচার আর চাঁদাবাজির কথা বলবে। উদীচী, সিপিবির জনসভা আর রমনার বটমূলে বোমা হামলার কথা বলবে, নৃশংস হত্যাকারীদের না ধরে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কথা বলবে। এক কথায়, এই সরকারের বিশাল বিশাল সব অর্জন শেষ মুহূর্তে সন্ত্রাস নামক শূন্য দিয়ে গুণ করে পুরোটুকু শূন্য করে ফেলবে।

২.

এটি আজকাল আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সন্ত্রাস ব্যাপারটি এখন একটি অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে গেছে। কিন্তু কেন জানি মনে হয় সেটি নিয়ে কারো সেরকম মাথাব্যথা নেই। এর কারণটা কী?

আমার মনে হয় যারা ব্যাপারটি নিয়ে কিছু একটা করতে পারেন তারা ব্যাপারটি, ঠিক বিশ্বাস করছেন না। সব মন্ত্রী মহোদয় দামি দামি গাড়িতে যান, তাদের সামনে-পেছনে পুলিশ থাকে, তারা হুইসেল বাজিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে অন্যদের জন্য ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করে চলে যান। কোনো সন্ত্রাসী তাদের জামার কলার চেপে ধরে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে যায় না। তাদের ছেলেমেয়েরা দেশে বিদেশের বড় বড় স্কুল-কলেজে পড়ে, মাঝ রাতে তারা ছুরিকাহত হয়ে হাসপাতালে যায় না। তাদের স্ত্রী বা কন্যাদের গার্মেন্টসের মেয়েদের মতো গভীর রাতে কাজ শেষে হেঁটে হেঁটে বস্তিতে ফিরতে হয় না, স্থানীয় মাস্তান তাদের ধর্ষণ করার জন্য তুলে নিয়ে যায় না। সন্ত্রাসের পুরো ব্যাপারটিই তারা দেখেন খবরের কাগজে, দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, এখন সেটা কাউকে বিচলিত করে না (হরতালের সময় প্রথমবার যখন একটা রিকশাওয়ালাকে পুড়িয়ে মারা হলো সারা জাতি তখন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আজকাল সেটা প্রায় রুটিন হয়ে গেছে। কেউ কিছু মনে করে না– অনেকটা সেরকম!)। সন্ত্রাসের খবরগুলোর গুরুত্ব একটু বেড়ে যায় যখন সেখানে নিজের দলের লোকজন থাকে, তাদের ছাড়িয়ে আনতে হয়, পুলিশের সঙ্গে কিংবা খবরের কাগজের লোকজনের সঙ্গে দেনদরবার করতে হয়।

এছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক অধিকার আওয়ামী লীগ সরকার খুব দ্রুত হারিয়ে ফেলছে। যে দলের একজন সাংসদের বাসায় বোমা ফ্যাক্টরিতে বোমা বিস্ফোরণ হয় সেই দল বোমাবাজির বিরুদ্ধে জোর দিয়ে কথা কেমন করে বলবে? যে দলের সাংসদের আশপাশে সন্ত্রাসীরা ওয়েস্টার্ন সিনেমার কায়দায় গুলি করতে থাকে সেই দল অস্ত্রবাজির বিরুদ্ধে মুখ খুলবে কোন মুখে? যে দলের সাংসদ এবং মন্ত্রিপুত্ররা খুন-জখম-চাঁদাবাজিতে সবার ওপরে, তারা অন্যদের খুন-জখম-চাঁদাবাজিতে বাধা দেবেন কোন লজ্জায়? কাজেই এখন ব্যাপারটিতে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছেন, যা হয় হোক এই ধরনের একটি ভাব সবার ভেতর।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন একেবারে বিষাক্ত হয়ে গেছে। বড় লোকেরা গাড়ি করে যায় বলে নিরাপদে থাকে, সাধারণ মানুষ যাদের রিকশা-টেম্পো কিংবা পায়ে হেঁটে যেতে হয় তাদের সঙ্গে কথা বললে শিউরে উঠতে হয়। আমার পরিচিত এমন কেউ নেই যে সন্ত্রাস নিয়ে নিজের কোনো অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেনি। মনে হয় এটি বুঝি সুস্থ কোনো দেশ নয়, এটা যেন ভয়ের কোনো সিনেমা থেকে উঠে আসা একটি দৃশ্য! যারা এটি থামাতে পারতেন তারা সেই সিনেমার দর্শক, আমরা বাকি সবাই সেই দৃশ্যের জীবন্ত অভিনেতা! নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরাবাস্তব সেই সিনেমায় অভিনয় করে যাচ্ছি।

৩.

যদি আমরা ধরে নিই বর্তমান সরকার সন্ত্রাস থামানোর ব্যাপারটি নিয়ে মোটেও উৎসাহী নয় তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়– যে দেশে একটা সরকার থাকে সেখানে আইন প্রয়োগকারী একটা প্রতিষ্ঠান থাকে, তারা কী করছে ? আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আগে হয়তো বিতর্ক করা যেত, আজকাল আর সেটা করার প্রয়োজন নেই। কিছুদিন হলো সেটা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। একটা সমীক্ষা করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পুলিশ বাহিনী। দেশের সব খবরের কাগজে সেটা ছাপা হয়েছে, কেউ সেটার সত্যতা নিয়ে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করেনি। পুলিশ বাহিনীও তার প্রতিবাদ করেছে বলে শুনিনি। আমার ধারণা তারা বরং হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আগে তবু লোক দেখানো একটু কাজকর্ম করতে হতো, এখন তারও প্রয়োজন নেই। পুলিশ বাহিনীকে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার পর সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। এখন দুর্নীতি করা তাদের নৈতিক অধিকারের মাঝে চলে এসেছে। সে জন্যই মনে হয় সমাজের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধগুলো– খুন করে পানির ট্যাংকে মৃতদেহ ডুবিয়ে রাখা বা কিশোরী মেয়েদের ধর্ষণ করে খুন করে ফেলা– এই ঘটনাগুলো করছে পুলিশরাই।

আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন, একাত্তর সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাকে মেরে ফেলেছিল বলে আজ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে আজ নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেতেন। পুলিশ বাহিনীতে যারা সৎ মানুষ রয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পান কিন্তু তাদের নিশ্চয়ই হাত-পা বাঁধা, তাই দেশের পরিসংখ্যানে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য আগে যেসব বই লিখেছি সেখানে পুলিশ অফিসারের চরিত্রগুলো ছিল সৎ, ইদানীং যেগুলো লিখছি নিজের অজান্তেই সেগুলো হয়ে যাচ্ছে অসৎ। আমার আশপাশে যাদের দেখি তাদের দেখে নীতিবান পুলিশের গল্প লেখা দিনে দিনে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এই দেশে পুলিশ শুধু যে অসৎ হিসেবে পরিচিত হয়েছে তাই নয়– তাদের কর্মদক্ষতা নিয়েও এখন সবার মনে প্রশ্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পুলিশের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সবচেয়ে কম। গত বছর মৌলবাদীদের সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বাসায় ২৪ ঘণ্টার জন্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। একদিন ভোরবেলায় আমাদের বাসায় বোমা মারা হলো। নিচে নেমে দেখি পুলিশের কোনো চিহ্ন নেই। হৈচৈ-চেঁচামেচি শুরু হলে দেখা গেল দুজন পুলিশ প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে আসছেন! মানুষের যখন কোনো কিছু বলার থাকে না তখন তারা কী বলে দেখার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের তো এখানে পাহারায় থাকার কথা, আপনারা কোথায় ছিলেন ?' একজন বললেন, 'আ-আ-আ-আ-আ-' বাক্যটি আর শেষ করলেন না।

সেই বোমায় কেউ আহত হয়নি বলে এতদিন পর আমি এর মাঝে কৌতুক খুঁজে পাচ্ছি, কিন্তু দেশে শত শত ঘটনা ঘটেছে যার মাঝে কোনো কৌতুক নেই।

যেটি একেবারে একশভাগ বিভীষিকা। যাদের আমাদের রক্ষা করার কথা, প্রাণভয়ে যখন তাদের থেকে আমরা পালিয়ে বেড়াই তার থেকে দুঃখের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না।

কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক ২০০০-এ পেশাদার খুনিদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়লে আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে একটি অন্যরকম ধারণা হয়। অপরাধ ব্যাপারটি তখন সম্পূর্ণ অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। পুলিশ বাহিনী আসলে একটি ইণ্ডাস্ট্রির মতো। ইণ্ডাস্ট্রি চালাতে কাঁচামাল লাগে, পুলিশের ইণ্ডাস্ট্রিতে সেই কাঁচামাল হচ্ছে অপরাধ। অপরাধ দমন করে ফেললে ইণ্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই সেটা দমন করা হয় না। সেটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, দুধ-কলা দিয়ে পোষা হয় এবং অপরাধী, তার আত্মীয়স্বজন, তার পক্ষে এবং বিপক্ষে যারা আছে তাদের সবাইকে যতদিন সম্ভব শোষণ করা হয়। এর মাঝে কোনো লুকোছাপা নেই। কোনো অপরাধ ঘটলে পুলিশ কেস নেবে কি নেবে না সেটা নির্ভর করে একশ একটা বিষয়ের ওপর– অপরাধ দমন তার মাঝে একটা নয়। আমার এক ছাত্রকে কিছু সন্ত্রাসী ধরে সবকিছু কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, সে কিছুতেই পুলিশের কাছে কেস করতে না পেরে আমার কাছে এসেছে। আমি থানায় ফোন করে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কারণটা জিজ্ঞেস করতেই তিনি হঠাৎ করে কেস নিতে রাজি হয়ে গেলেন। আমি ছাত্রকে জানানোর পর দেখলাম সে ততক্ষণে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাইকে আজকাল আর অপরাধ হিসেবেও বিবেচনা করা হয় না। একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে এক সঙ্গে আটদশজনকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত আজকাল আমরা সেটাকে অপরাধই মনে করি না।

৪.

সামনে নির্বাচন আসছে। নির্বাচনে জেতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কাজকর্ম শুরু করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষে ভোট নিয়েই তো নির্বাচনে জিততে হয়, সবাই তো আর দলীয় কর্মী নয় যে একেবারে চোখ বুজে দলের পক্ষে ভোট দেবে। সেই সাধারণ মানুষের দিকে কেউ তাকায় না কেন ? বিরোধী দল হরতাল ডেকে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করে সেটাকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে বোঝানোর চেষ্টা করছে। সরকার সন্ত্রাসকে শিল্প পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। রমনার বটমূলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মানবিক কষ্টটুকু তাদের চোখে পড়ে না, অপরাধী ধরায় তাদের কোনো উৎসাহ নেই, এই পৈশাচিক ঘটনাটি কীভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে সেটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সাধারণ মানুষ তো রাজনৈতিক নেতাদের মতো একচক্ষু হরিণ নয়, তারা তো সবকিছুই বোঝে, তাহলে তাদের সঙ্গে এই ছলনা কেন ?

বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য লেখালেখি করি বলে আমি তাদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পাই। কিছুদিন আগে একটি স্কুলের কিশোরী মেয়ের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। সে তার এলাকার উচ্ছৃঙ্খল কিছু সন্ত্রাসীর জন্য স্কুলে যেতে পারে না, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মেয়েটি জেনেছে সন্ত্রাসী ছেলেগুলো ছাত্রলীগ

করে, কাজেই সে নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি হেরে যায় তাহলে ছাত্রলীগ করা এই সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য কমবে, তখন সে আবার স্কুলে যেতে পারবে। মেয়েটি আমাকে লিখেছে, সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আশা করছে আওয়ামী লীগ যেন ইলেকশনে হেরে যায়– তাহলে সে আবার স্কুলে যেতে পারবে।

মেয়েটির চিঠিটা পড়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। আওয়ামী লীগ সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা বলেছে, গণতন্ত্রের কথা বলেছে, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছে, স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিরোধ করে সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করার কথা বলেছে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলেছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলেছে কিন্তু ছোট একটি মেয়ের কাছে তার কোনো মূল্য নেই, কোনো অর্থ নেই। বাংলাদেশে এ রকম মেয়ে কতজন আছে আমি জানি না। কিন্তু সন্ত্রাসের কাছে পরাজিত, আশাহত, বীতশ্রদ্ধ, স্বপ্নভঙ্গ, প্রতারিত, ক্ষুব্ধ, ক্রোধান্বিত মানুষের সংখ্যা কম নয়– আমরা সেটা জানি।

সামনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় হয়ে আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তথ্যপ্রযুক্তি, খাদ্য-বাসস্থান সবকিছু পেয়ে যাই কিন্তু সেই মেয়েটি যদি আর স্কুলে যেতে না পারে তাহলে সেই বিজয় দিয়ে আমরা কী করব ? এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই কি বাংলাদেশ নয় ? তাদের একজনের স্বপ্ন ভঙ্গ করেও কি একটা দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা যায় ?

প্রথম আলো
১০ মে, ২০০১

সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেব্‌ল এবং অন্যান্য মিথ

আমাদের দেশে যারা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে খোঁজখবর রাখেন তাদের প্রায় সবাই জানেন, আশির দশকে আমাদের দেশকে সাবমেরিন ফাইবার অপটিক কেবলের সঙ্গে সংযোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। সে সময়কার সরকার সেই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছিল বলে এখনো পৃথিবীর মূল নেটওয়ার্কের সঙ্গে আমাদের ফাইবার অপটিক সংযোগ নেই এবং সারা পৃথিবীর মাঝে নিজেদেরকে মোটামুটিভাবে পশ্চাৎমুখী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিমুখ জাতি হিসেবে নিজেদের স্থান করে রেখেছি। যে সুযোগটি কোনো একটা কাগজে স্বাক্ষর করেই হয়তো পাওয়া যেত, এখন সেটা পাওয়ার জন্য ৫০০ থেকে হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হবে। এই সাবমেরিন কেবলের জন্য চেষ্টা চলছে, সব কিছু ভালোয় ভালোয় শুরু হওয়ার পরও কেবলটি বসতে প্রায় দুবছর সময় লেগে যাওয়ার কথা।

এই ফাইবার অপটিক কেব্‌ল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বলে এখন এর গুরুত্বটি বুঝতে কারো বাকি নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এর ওপরে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে অনেকেরই ধারণা এই সাবমেরিন কেব্‌লটিই আমাদের একমাত্র এবং শেষ প্রতিবন্ধক এবং এটি সম্পন্ন হওয়া মাত্রই আমাদের হাতে তথ্যপ্রযুক্তির আলাদীনের প্রদীপ চলে আসবে এবং আমাদের দেশে বন্যার পানির মতো ডলার আসতে শুরু করবে। আমার মনে হয়, সাবমেরিন কেবলের মতো আমাদের মাঝে আরো কিছু মিথ রয়েছে যেগুলো খানিকটা পরিষ্কার করা দরকার।

১. ঢাকাবাসীর জন্য সুখবর

ফাইবার অপটিক কেব্‌ল হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম এক ধরনের কাচের তন্তু (৮ মাইক্রন), যার ভেতর দিয়ে অবলোহিত রশ্মি (Infrared) ব্যবহার করে তথ্য পাঠানো হয়। গত দুই দশকে এই প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়েছে যে একটি কাচের তন্তুতে একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ব্যবহার করে অনায়াসে ১০ জিগা বাইট তথ্য পাঠানো সম্ভব। খুব সাধারণভাবে (এবং একটু সরলীকরণ করে) বোঝানোর জন্য বলা যেতে পারে এই মুহূর্তে কেনা যায় এ রকম প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ১ লাখ VSAT-এর মাধ্যমে যে পরিমাণ তথ্য পাঠানো সম্ভব, একটি ফাইবার কেব্‌ল দিয়েই তার সমপরিমাণ তথ্য পাঠানো সম্ভব। তুলনা করার জন্য বলা যায় আমাদের দেশে এখন ৫০ থেকে ৬০টি VSAT রয়েছে।

আমাদের প্রস্তাবিত ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ দেওয়া হবে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেব্‌ল টানা আছে বলে সেই সংযোগ ঢাকা পর্যন্ত পৌছবে। ঢাকা থেকে সেটি সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো প্রস্তুতি নেই, কাজেই এই সাবমেরিন কেব্‌ল সংযোগ দেওয়ায় সারা দেশের

কোন লাভ হবে না, লাভ হবে শুধু ঢাকাবাসীর! (আমরা যারা মফস্বলে থাকি তারা সেই ব্যাপারটি অনেক দিন থেকে জানি। মাঝে মাঝে অন্যদের মনে করিয়ে দিয়ে ভেতরের জ্বালা খানিকটা প্রকাশ করি। এর বেশি কিছু নয়।) বাংলাদেশে সিঙ্গল মোড ফাইবারের আরো একটি নেটওয়ার্ক আছে (চারটি ফাইবারের ৫৬ কি.মি. এবং দুটি ফাইবারের দেড় হাজার কি.মি.)। তার মালিকানা রেলওয়ে বিভাগের এবং অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে গ্রামীণফোন তার ব্যাণ্ড-উইডথ ব্যবহার করছে।

সাবমেরিন কেবলের ব্যাণ্ড-উইডথ ব্যবহৃত করার জন্য সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক জাতীয় কোনো ধরনের অবকাঠামো তৈরি করা না হলে সেটি সারা দেশের জন্য কোনো সুখবর নয়। বাংলাদেশ আকারে খুব ছোট, এই দেশে এ রকম একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

এখানে আরো একটি ব্যাপার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়। ভারতে নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকা সত্ত্বেও অনেকে VSAT ব্যবহার করে তথ্যের আদান-প্রদান করে থাকে। বড় ব্যাণ্ড উইডথের সুবিধাটুকু গ্রহণ করলে তার খরচও বাড়াবাড়ি কিছু নয়। কাজেই যতদিন ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ না হচ্ছে ততদিন হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো যুক্তি নেই। বিশেষ করে আমরা যারা মফস্বলে থাকি সেটা সম্ভবত আমাদের এখনো দীর্ঘদিনের জন্য একমাত্র সমাধান।

২. শহরে এসেছে বাড়িতে আসেনি

ফাইবার অপটিক কেবলের সংযোগ হওয়ার পর সেটি শহরে আসবে কিন্তু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসবে না। বাড়ি পর্যন্ত আসার জন্য এখনো একমাত্র উপায় টেলিফোন লাইন এবং এই দেশে প্রতি ২০০ জন মানুষের মাঝে মাত্র একজন মানুষের টেলিফোন রয়েছে (০.৫%)। শুধু যে সংখ্যা কম তাই নয়, টেলিফোন সংযোগ নেওয়ার ব্যয়ও সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে বেশি। কাজেই টেলিফোনকে সহজলভ্য করে না তোলা পর্যন্ত এই সুযোগটি প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারবে না।

৩. নৌকা এবং পালকির দেশ বাংলাদেশ ?

গত বছর আমি একটা কাজে জার্মানি গিয়েছিলাম। যে শহরে ছিলাম ঘটনাক্রমে সেখানেই আন্তর্জাতিক Expo অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সেখানে বাংলাদেশের একটা চমৎকার প্যাভেলিয়ন ছিল। সেখানে ছিল একটা নৌকা, একটা রিকশা, একটা পালকি, খড়ে ছাওয়া একটি কুড়েঘর, বাঁশঝাড় এবং সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা একটা নকশি কাঁথা (পাশেই পাকিস্তানের প্যাভেলিয়নটি ছিল মূলত ফার্নিচারের দোকান, যদিও দেশটি নিজেদের মুসলিম দেশ বলে দাবি করে কিন্তু দেখলাম তারা বেশ আয়োজন করেই মদের বোতল রাখার র‍্যাক বিক্রি করছে)। বাংলাদেশের অত্যন্ত চমৎকার প্যাভেলিয়নটি দেখে কিন্তু আমার মন খারাপ হয়েছিল। আমরা না চাইতেই সারা পৃথিবীতে আমাদেরকে অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় পীড়িত একটি দেশ হিসেবে দেখানো হয়, যখন আমরা নিজেদেরকে অন্যদের

সামনে দেখানোর সুযোগ পাই তখন কি নিজেদেরকে একটি ভবিষ্যৎমুখী দেশ হিসেবে দেখাতে পারি না ? পালকি এই দেশ থেকে উঠে গেছে। নৌকাতে শ্যালো ইঞ্জিন লাগানো হয়। ঢাকার বড় রাস্তায় রিকশা চালাতে দেওয়া হয় না– ইয়েলো ক্যাব চালানো হয়। যার একটু সামর্থ্য আছে কুড়েঘরের বদলে টিনের ঘর তুলছে– তাহলে কেন আমরা দেশীয় সংস্কৃতির নামে নিজেদের একটা গ্রাম্য পরিচয় তুলে ধরছি ? এই দেশের প্রকৃত উন্নতির জন্য আমাদের সেই গ্রামেই ফিরে যেতে হবে– সেটি আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই দেশে তথ্যপ্রযুক্তি আনতে চাইছি তখন তো নিজেদেরকে গ্রাম্য, পশ্চাৎমুখী হিসেবে পরিচয় দিলে হবে না–একটু অতিরঞ্জন করে হলেও আধুনিক একটা পরিচয় তুলে ধরতে হবে। ইজরায়েল তার প্যাভেলিয়নটিতে নামের বানান করেছে ISR@EL– দেখেই বোঝা যায় তারা পৃথিবীর সামনে নিজেদের অন্য একটি পরিচয় নিয়ে আসছে। আমরা তাহলে কেন পৃথিবীর সামনে নিজেদের পরিচয়টি ভালো করার চেষ্টা করছি না। সিলিকন ভ্যালিতে বেশির ভাগ মানুষ নাকি ভারতীয় কিন্তু আমরা জানি বিলেতে যে রকম ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের বেশির ভাগ বাংলাদেশের ঠিক সে রকম সিলিকন ভ্যালিতে যাদের ভারতীয় বলা হয় তাদের অনেকেই বাংলাদেশের। তাদের পরিচয়, পরিসংখ্যান দিয়ে অনেক আয়োজন করে এখন পৃথিবীর সামনে আমাদের নতুন পরিচয় নিয়ে বের হওয়ার সময় এসেছে।

৪. আইটি নয়– আইসিটি

আইটি (Information Technology) বা তথ্যপ্রযুক্তি কথাটি এখন বাংলাদেশের একটি ঘরের কথা হয়ে গেছে। এ দেশের নতুন প্রজন্ম এই কথাটি নিয়ে খুব উৎসাহী। বলা যেতে পারে যে এটি এই দেশের মানুষের একটি বড় সাফল্য যে আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎসাহী করতে পেরেছি। আমাদের দেশে বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদেরকে জনশক্তিতে পাল্টে দেওয়ার প্রথম ধাপটি আসলে করা হয়ে গেছে।

কিন্তু এর মাঝে একটি ব্যাপার ঘটে গেছে বছরখানেক থেকে আইটি কথাটি পরিবর্তিত হয়ে আইসিটি হয়ে গেছে। পুরো কথাটি এখন Information and Communications Technology অর্থাৎ কমিউনিকেশান্স সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারকেও এর মাঝে নিয়ে আসা হয়েছে (ফ্যাক্স থেকে কেবল টিভি, মোবাইল ফোন থেকে ফাইবার অপটিক সবকিছু) এবং তার সঙ্গে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো যে শুধু জনশক্তি তৈরি করে তথ্যপ্রযুক্তির এই বিপ্লবে প্রবেশ করা যাবে না– তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। আমাদের প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে– তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে প্রবেশ করতে হলে প্রয়োজন দেশজোড়া নেটওয়ার্ক টেলিফোন সংযোগ, ওয়ারলেস প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট এবং স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, ফাইবার অপটিক প্রযুক্তিবিদ এবং কমিউনিকেশানসের মানুষ। এর মাঝে আর কোনো শর্টকাট নেই।

৫. ভাষা নয়– টেকনোলজি

আমি যে বছর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেশে চলে এসেছি ঠিক সেই বছর আমার কর্মস্থল (বেল কমিউনিকেশান্স ল্যাব) থেকে বেশ কয়েকজন আলাদা হয়ে টেলিয়াম নামে অপটিক্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর একটি কোম্পানি শুরু করেছিল। ওই কোম্পানিতে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সবাই আমার সহকর্মী দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেখানে কৃষ্ণা বালা নামে একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ক্যান্টিনে বসে আমরা দীর্ঘ সময় জগৎ-সংসারের অস্তিত্ব, ধর্ম-সংস্কৃতি, এসব বড় বড় জিনিস নিয়ে কথা বলতাম। নতুন কোম্পানি যদি সফল হতে পারে তাহলে তারা পাবলিক হওয়ার পর হঠাৎ করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায়। তাই আমি মাঝে মাঝে যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়েছি, তখন কৃষ্ণা বালাকে ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করেছি সে মিলিওনিয়ার হয়ে গেছে কিনা। প্রতিবারই সে আমার ঠাট্টার জবাবে মুচকি হেসে জানিয়েছে, এখনো হয়নি। এবারে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা হয়নি কারণ সে কোম্পানির সিটিও হয়ে সারা আমেরিকা চষে বেড়াচ্ছে। কোম্পানি পাবলিক হয়েছে এবং অন্যদের কাছে খবর পেয়েছি সে কয়েকশ মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েছে। বিজনেস ইণ্ডিয়া ম্যাগাজিনের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমেরিকার সফল আইটি ব্যক্তিত্বদের মাঝে কৃষ্ণা বালার নাম-পরিচয়সহ বিশাল প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

কৃষ্ণা বালা খুব প্রতিভাবান ছেলে, অপটিক্যাল নেটওয়ার্কে তার তাত্ত্বিক জ্ঞান তুখোড়, এর ওপরে তার লেখা বই রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তার সাফল্যটি এসেছে অন্য জায়গা থেকে– সেটি এসেছে তার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা, খুব সুন্দর করে কথা বলে মানুষকে মুগ্ধ করা, গুছিয়ে লেখা এবং গুছিয়ে প্রকাশ করা থেকে। এই ব্যাপারটির গুরুত্ব যে কত বড় সেটি আমাদের দেশে এখনো ধরতে পারিনি। আমরা প্রতিভাবান মানুষ তৈরি করে ছেড়ে দেই। তাকে সুন্দর করে কথা বলা শিখিয়ে দেই না।

আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাই তাহলে আমাদেরকে প্রযুক্তির সঙ্গে আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন নতুন একটি জিনিস শিখতে হবে। সেটি হচ্ছে কথা বলে এবং লিখে নিজেকে প্রকাশ করা এবং এটি হতে হবে ইংরেজিতে। এখানে ইংরেজি এখন আর ভাষা নয়, এটি এখন একটি প্রযুক্তি। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে এখন শুদ্ধ ইংরেজিতে কথা বলা এবং লেখা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। শুধু যে পাশ্চাত্য দেশের জন্য এর প্রয়োজন তা নয়। অতি সম্প্রতি জাপান এ ক্ষেত্রে ভালো ইংরেজি জানা মানুষ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এতদিন জাপানি ভাষাজ্ঞানকে খুব গুরুত্ব দিত, কিন্তু এখন ইংরেজিতেই সন্তুষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কাজেই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য আমাদের শুধু তথ্যপ্রযুক্তি জানলেই হবে না, ইংরেজি জানতে হবে। কেউ যেন মনে না করে আমি পুরো শিক্ষা পদ্ধতি পাল্টে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলছি। আমি বিশ্বাস করি

মাতৃভাষায় শেখার কোনো বিকল্প নেই। তারপরও আমাদের দেশে ১০ বছর স্কুল, দুই বছর কলেজ এবং চার বছর কলেজ/ইউনিভার্সিটিতে যেটুকু ইংরেজি শেখার কথা সেটা যথেষ্ট– যদি সেটা ঠিকমতো করা হতো। সেটাই ঠিকমতো করতে হবে, তার কোনো গত্যন্তর নেই।

৬. প্রোগ্রামার বনাম প্রজেক্ট ম্যানেজার

কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে প্রোগ্রামিং করতে পারে সে রকম মানুষের সংখ্যা ছিল খুব কম, ইদানীং বেশ কিছু তরুণ-তরুণী বের হয়ে এসেছে। অনেক সফটওয়্যার কোম্পানি নিজেরাই নতুন করে প্রোগ্রামার তৈরি করে নিয়ে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার চেষ্টা করছে এবং তখন হঠাৎ করে তারা একটা রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছে। সফটওয়্যারের বড় প্রজেক্ট হাতে নিতে হলে প্রোগ্রামারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন প্রজেক্ট ম্যানেজার, সিস্টেমস এনালিস্ট, ডিজাইন আর্কিটেক্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা ডকুমেন্টেশান স্পেশালিস্টের মতো নানা ধরনের মানুষ। সত্যি কথা বলতে কী, সফটওয়্যারের একটা বড় প্রজেক্টে সত্যিকারে প্রোগ্রামিং বা কোড লেখার জন্য সময় হয় খুব বেশি হলে ২০%– বেশির ভাগ কাজই হচ্ছে তার প্রস্তুতি, তার ডিজাইন, তার পরীক্ষণ ইত্যাদি। কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষা নিয়ে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রোগ্রামার ছাড়া অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বলতে গেলে নেই, যারা আছে তাদের অভিজ্ঞতা খুবই কম। যেটা সমস্যা সেটি হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোর্স দিয়ে এ ধরনের মানুষ তৈরি করা সম্ভব নয়– এদেরকে গড়ে উঠতে হয় সত্যিকারের কাজের মাধ্যমে।

কাজেই সফটওয়্যার শিল্পে বড় হাতে অগ্রসর হতে হলে আমাদের প্রচুর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭. বন্ধুর ছেলে প্রোগ্রাম লিখে দেবে

সফটওয়্যার নিয়ে কথা বললে অনেককেই বলতে শুনেছি, তার বন্ধুর এক মেধাবী ছেলে আছে, সে দিনরাত কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে, সে তার প্রতিষ্ঠানের জন্য সফটওয়্যার লিখে দেবে। সাধারণত কমবয়সী ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝেই মেধার এক ধরনের বিস্ফুরণ দেখায়। কিন্তু তাদেরকে দিয়ে প্রফেশনাল কাজ করানো যায় না। সবাইকে বুঝতে হবে এটি একটি শিল্প, ঘরে বসে টুকটাক কাজ করে এই শিল্প গড়ে তোলা যায় না। কেউ যদি সত্যিকারের একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করতে চায় তাহলে সেটি সত্যিকার সফটওয়্যার কোম্পানিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিতে হবে এবং সে জন্য অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন সেটি খুব সহজে, দ্রুত এবং অত্যন্ত অল্প খরচে তৈরি করিয়ে নেবেন। রেডিমেড পেয়ে গেলে সেটি হতে পারে কিন্তু নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি সফটওয়্যার তৈরি করতে হলে সেটি সময় এবং খরচ সাপেক্ষ হবে, সেটি তাদের মেনে নিতে হবে। সফটওয়্যারের জন্য এই অর্থ ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা কয়েকগুণ বাড়িয়ে নেওয়া যায় বলে এই অর্থ ব্যয় আসলে এক ধরনের বিনিয়োগ।

৮. সবাই হবে প্রোগ্রামার ?

যে কারণেই হোক অনেকের মাঝে একটা প্রচলিত বিশ্বাসের জন্ম হয়ে গেছে যে, তথ্যপ্রযুক্তিতে অবদান রাখতে হলে তাকে প্রোগ্রামার হতে হবে। এই ধারণাটি সত্যি নয়। সবাইকে প্রোগ্রামার হতে হবে না এবং সবাই চেষ্টা করলেও ভালো প্রোগ্রামার হতে পারবে না। যে কারণে সবাই অঙ্কের প্রফেসর বা গায়ক বা নৃত্যশিল্পী হতে পারে না, সে কারণে সবাই প্রোগ্রামার হতে পারে না। কিন্তু যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে সবাই প্রোগ্রামার না হয়েও কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তিতে কাজ করতে পারে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে অনেক কাজ করা হয়। ইদানীং যে কয়টির নাম খুব বেশি শোনা যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মেডিকেল ট্রান্সক্রিপ্ট, মাল্টিমিডিয়া, ওয়েবপেজ ডিজাইন ইত্যাদি। প্রোগ্রামার না হয়েও এসব ক্ষেত্রে কাজ করা সম্ভব এবং সৃজনশীলতা ব্যবহার করে এ ধরনের আরো নতুন নতুন ক্ষেত্র বের করা সম্ভব।

৯. শিশু এবং কম্পিউটার

কিছুদিন আগে একটা সমীক্ষায় দেখেছি, বাংলাদেশের প্রতি ৩০০ মানুষের জন্য একটি কম্পিউটার রয়েছে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশের জন্য সংখ্যাটি কিন্তু বিশাল। তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে অনেক আশার কথা শুনে অনেক মধ্যবিত্ত বাবা-মাও অনেক ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে ছেলেমেয়ের জন্য কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন। তাদের অনেক ছেলেমেয়ে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করছে। কিন্তু তাদের জেনে রাখা ভালো যে কম্পিউটার একটি বিচিত্র যন্ত্র, এটি ব্যবহার করে একদিকে যে রকম সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব অন্যদিকে ঠিক সে রকম অর্থহীন কম্পিউটার গেম খেলে সময়ের অপচয় করা সম্ভব। কম্পিউটারে খেলার জন্য যেসব গেম আবিষ্কার হয়েছে তার বেশির ভাগ দিয়ে খেলা আর টেলিভিশনে কার্টুন দেখে সময় নষ্ট করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

তবে আশার কথা হচ্ছে, ছোট বাচ্চাদের মস্তিষ্ক কম্পিউটারকে সৃজনশীল কাজে ব্যবহার করতে পারে খুব সহজে। আমি ১০-১২ বছরের বাচ্চাকেও ভিজুয়াল বেসিকে প্রোগ্রামিং করতে দেখেছি। কাজেই কারো বাসায় কম্পিউটার থাকলে বাসার বাচ্চা-কাচ্চাকে প্রোগ্রামিং করতে উৎসাহ দেওয়া জরুরি। আজকাল বাংলাতেও অনেক বই বের হয়েছে। একবার একটি শিশু যদি প্রোগ্রামিং ব্যাপারটি কী ধরে ফেলতে পারে তার সৃজনশীল ক্ষমতাকে আর কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না।

১০. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

ডাক শুনে কেউ না এলে কবিগুরু একলা চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তথ্যপ্রযুক্তির বেলায় কিন্তু সেটি সত্যি নয়। এখানে একলা চলে অল্প কিছুদূর যাওয়া যাবে কিন্তু পুরোটুকু যাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন এনআরবি (Non Resident

Bangladeshi) বা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাহায্য। যারা এ দেশে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন তাদের পক্ষে সরাসরি পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব কঠিন, কাজেই আমাদের সফটওয়্যার শিল্পকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে এনআরবির সাহায্য খুব দরকার। আমরা আশা করে আছি দেশের প্রয়োজনে তারা নিজের থেকে এগিয়ে আসবেন। এ দেশে যারা আছেন তারা ব্যাপারটি সহজ করার জন্য যেন প্রস্তুত থাকেন।

১১. অভ্যন্তরীণ বাজার

আমার ভাবনা-চিন্তায় যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি জরুরি মনে হয়েছে সেটি রেখেছি সবচেয়ে শেষে। সফটওয়্যার শিল্প দ্রুত গড়ে উঠতে পারে না, এর জন্য সময়ের দরকার। যারা দ্রুত অর্থোপার্জন করতে চেয়েছেন তারা ট্রেনিং সেন্টার খুলেছিলেন এবং সেখানেও অনেকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে বলে শিক্ষার্থীরা খুব সাবধানে অগ্রসর হচ্ছে। আমার ধারণা অনেক অর্থ ব্যয় করে দায়সারা কোর্স নেওয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে। একটা সফটওয়্যার শিল্পকে দাঁড়ানোর জন্য যে সময়টুকু দরকার সেটি খুব খরচ সাপেক্ষ। মাসের পর মাস প্রোগ্রামারদের বেতন গুনতে হয় কিন্তু করার মতো কাজ নেই। এই প্রোগ্রামারদের প্রয়োজনীয় কাজ খুঁজে দিতে হবে। দেশের ভেতরেই প্রচুর কাজ রয়েছে, সেই কাজগুলো সফটওয়্যার শিল্পের সামনে তুলে ধরতে হবে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য ব্যাংক, মন্ত্রণালয়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা বলা যায়। সবাই যদি নিজেদের কম্পিউটারায়নের কাজ শুরু করে দেয় তাহলে দেশে একটা বিশাল কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে, দেশের প্রোগ্রামাররা হাত পাকানোর জন্য কাজ খুঁজে পাবেন।

আমার মনে হয়, দেশের সফটওয়্যার শিল্পকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই অভ্যন্তরীণ বাজার। নিজ থেকে এটা যদি তৈরি হতে শুরু না করে তবে 'জাম্প স্টার্ট' দিয়ে এটাকে শুরু করিয়ে দিতে হবে। সফটওয়্যার শিল্পের জন্য এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি।

৭ জুন ২০০১

রাজনীতিতে নীতি ফিরে পেতে চাই

১.

দুজন মানুষ কথা বলছে। প্রথমজন বলল, 'আমাদের দেশের রাজনীতিটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয়জন জানতে চাইল, 'কেন?'

প্রথমজন মাথা নেড়ে বলল, 'রাজনীতির মাঝে পলিটিক্স ঢুকে গেছে!'

এটি একটি কৌতুক, এবং অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ ভালো একটি কৌতুক। তবে মজার ব্যাপার হলো কেউ যদি এটাকে কৌতুক হিসেবে না নিয়ে আক্ষরিক অর্থে নিতে চায় তাকেও বাধা দেওয়া যাবে না। রাজনীতি শব্দটির মাঝে 'নীতি' নামের খুব মহৎ একটা শব্দ রয়েছে, কাজেই সেই রাজনীতির মাঝে কোনো মহত্ব খুঁজে না পেয়ে কেউ যদি সেটাকে 'দূষিত পলিটিক্স' বলে ডাকতে চান আমরা তাকে বাধা দিতে পারব না।

আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আমাদের দেশে রাজনীতি বা পলিটিক্স শব্দটি একটি দূষিত শব্দে পরিণত হয়েছে। বাবা-মা যখন মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজেন তারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার খোঁজেন, ভুলেও একজন রাজনৈতিক নেতা খোঁজেন না। (আমি অনেক ঘটনার কথা জানি যেখানে রাজনৈতিক নেতা কোনো মেয়ের প্রতি কৌতূহল দেখিয়েছেন জেনে বাবা-মায়ের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেছে।) সন্তানদের মানুষ করতে গিয়ে যে বাবা দিন-রাত্তির খাটা-খাটুনি করে, যে মা জীবনপাত করে তার সন্তানেরা বড় হয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, প্রফেসর হবে কল্পনা করে, কবি সাহিত্যিক বা শিল্পী হওয়াকেও মেনে নেয়, কিন্তু ভুলেও কখনো চিন্তা করে না যে তারা বড় হয়ে রাজনৈতিক নেতা হবে। রাজনৈতিক নেতা শুনলে আমাদের চোখের সামনে দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ, আন্তরিক, সৎ একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে না, আজকাল স্বল্পশিক্ষিত, বিত্তশালী, সুবিধাবাদী, সন্ত্রাসী ধরনের গডফাদার টাইপের একজন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে। আমি ঢালাওভাবে সকল রাজনৈতিক নেতাদের অপমান করার জন্য এটি লিখছি না, শুধু সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে যেভাবে চলছে সেভাবে চললে রাজনৈতিক নেতা কথাটি কিছুদিনের মাঝে একটি অপমানসূচক কথা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ছাত্র রাজনীতির জন্য সেটা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে- সাধারণ ছাত্রছাত্রী এটাকে পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে, চাঁদাবাজি, ঠিকাদারী, মস্তানি বা লেজুড়বৃত্তি করা ছাড়া অন্য কারো ছাত্র রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। রাজনীতির বেলাতেও সেটা যদি ঘটে যায় তাহলে এটি হবে আমাদের জন্য একটি মস্ত দুর্ভাগ্য। কারণ এই দেশের সবচেয়ে বড় বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে। এই রাজনীতিতে যদি সাধারণ মানুষের সম্মানবোধ না থাকে, যদি বিবেকবান

মানুষেরা এই অঙ্গনটি নিজেদের অঙ্গন নয় মনে করে দূরে সরে থাকেন তাহলে আর কখনো বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, নেলসন ম্যান্ডেলা বা মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হবে না। আমরা শুধু গণ্ডায় গণ্ডায় জয়নাল হাজারী এবং নাসিরুদ্দিন পিন্টুর জন্ম দিয়ে যাব।

রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে আমরা যত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করি না কেন, তাদের সম্পর্কে আমরা যত অপমানসূচক কথাই বলি না কেন, এই কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই রাজনৈতিক নেতাদের ওপরে। এই দেশের আদর্শ কি হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নাকি পশ্চাৎমুখী সাম্প্রদায়িক- সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রাজনৈতিকভাবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা হবে নাকি ভুখা দেশ হিসেবে বাইরে থেকে ভিক্ষা নেওয়া হবে সেই সিদ্ধান্তটিও নেওয়া হয় রাজনৈতিকভাবে। সংবিধানকে অবিকৃত রাখা হবে নাকি সংশোধনের নাম দিয়ে সেখানে ক্ষতের সৃষ্টি করে দেশের লাখ লাখ মানুষের ভাগ্য মুহূর্তে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে, সেটাও ঠিক করা হয় রাজনৈতিকভাবে। শিক্ষার খাতে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করা হবে নাকি সামরিক খাতে, সেটাও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আবার শিক্ষার খাতে যে অর্থ ব্যয় করা হবে তার বড় অংশটুকু কি যাবে মাদ্রাসায় নাকি স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেটাও ঠিক করা হয় রাজনৈতিকভাবে। এক কথায় একটি দেশ কি এগিয়ে যাবে, থমকে দাঁড়াবে নাকি মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে তার পুরোটুকু নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ওপর। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবে যে মানুষগুলো সেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে, শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, তাহলে কেমন করে একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে? আমরা যদি এই দেশকে সুস্থ একটা দেশ হিসেবে তৈরি করতে চাই তাহলে সবার আগে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর শ্রদ্ধাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু সেই কাজটা কে করবে? আমরা, নাকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ?

২.

আমরা সেই কাজটা করতে পারব না। সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের রাজনৈতিক জ্ঞান খুব অল্প। কোনো রকম রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়াই কেন দেশের রাজনীতির ওপর আমি একটা গুরুগম্ভীর লেখা ফেঁদে বসেছি? উত্তরটি সহজ- এই দেশে আমাদের মতো মানুষের সংখ্যাই বেশি এবং আমরা রাজনীতি নিয়ে কী ভাবি সেটা অন্যদের জানা উচিত। যেই দেশে নির্বাচন করে সরকার পরিবর্তন করার পরীক্ষিত একটা পদ্ধতি আছে সেই দেশে আন্দোলন করে কেন সরকার হটাতে হবে সেটা আমাদের মাথায় ঢোকে না। হরতালকে কেউ দুচোখে দেখতে পারে না এবং যারা হরতাল ডেকে দেশকে অচল রাখে, রিকশাওয়ালাদের পুড়িয়ে মারে, দিন মজুরদেরকে অভুক্ত রাখে, মানুষ তাদের অভিশাপ দেয়, তবু কেন তারা হরতাল ডাকে সেটাও আমরা বুঝি না। দলের সন্ত্রাসী সেই দলের শুধু ক্ষতিই করে যায় তবু কেন তাদের গ্রেপ্তার করে দলের সুনাম বৃদ্ধি করা হয় না সেটাও আমরা বুঝি না। রমনার বটমূলে, গির্জায় বা নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের অফিসে বোমা মেরে

একেবারে নিরীহ মানুষজনকে খুন করার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে একটি রাজনৈতিক দল বুঝে ফেলে সেটি অন্য রাজনৈতিক দল করেছে সেটাও আমরা বুঝি না। মিটিংয়ে-মিছিলে বক্তৃতা দিয়ে কিংবা পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে একটা ডাহা মিথ্যা কথা বললে সেটা যে একটা ১০ বছরের বাচ্চাও বুঝতে পারে সেটা কেন রাজনৈতিক নেতারা ধরতে পারেন না, সেটাও আমরা জানি না। নির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়েও সংসদে কথা না বলে কেন রাস্তাঘাটে ছোটাছুটি করতে হয় সেটাও আমরা বুঝি না। প্রতিপক্ষকে ছোট করার জন্য একেবারে নির্লজ্জভাবে মুখ খিস্তি করে গালি-গালাজ করলে যে আমাদের কারো শুনতে ভালো লাগে না এই সহজ জিনিসটিও কেন তাদের মাথায় ঢোকে না, সেটাও আমরা বুঝতে পারি না। এই তালিকা ইচ্ছে করলে আরো দীর্ঘ করা যায় কিন্তু মনে হয় তার প্রয়োজন নেই। একটা রাজনৈতিক দলের অন্ধ সমর্থক হয়তো সব মিলিয়ে ১ থেকে ২ লাখ হবে ভোটারদের বাকি ৭ কোটি মানুষ কিন্তু আমাদের মতো। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য ভালোবাসা থাকতে পারে কিন্তু অন্ধ সমর্থকদের মতো তারা কখনোই দিনকে রাত কিংবা রাতকে দিন বিশ্বাস করতে রাজি না। আমার বিবেচনায় মনে হয়, রাজনৈতিক দলের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করা উচিত আমাদের মতো মানুষদের মনোরঞ্জন করার জন্য কিন্তু উল্টো তারা কেন আমাদেরকে পীড়ন করে যাচ্ছে সেটিও বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। দেশের সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত না করে শুধু অস্ত্র দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে ভোট কিনে কি একটি জাতীয় নির্বাচন জেতা যায় ? যে যাই বলুক আমি সেটা বিশ্বাস করি না।

কাজেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে একটা শ্রদ্ধার আসনে বসানোর কাজটি করতে হবে তাদের নিজেদেরকেই। আমরা যদি তার জন্য চেষ্টাও করি কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমরা যদি বলি রাজনৈতিক নেতারা আসলে অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি, কিন্তু যদি দেখা যায়, তারা জনসভায় বলছেন আছাড় মেরে প্রতিপক্ষের কোমর ভেঙে ফেলবেন তখন তাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর সম্মান রাখা খুব মুশকিল। আমরা তো আমাদের বাসায় আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোনকে এই রকম অভদ্র-অশালীন ভাষায় কথা বলতে শুনি না, তাহলে এই দেশের মানুষের নেতারা কেন এই ভাষায় কথা বলবেন ? দেশের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মানুষটিকেও আমরা প্রতিপক্ষকে নাকে খত দেওয়ার কথা বলতে শুনেছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক দলগুলো রুটিন মাফিক প্রগতিশীল মানুষের নাম উল্লেখ করে তাদের খুন করে ফেলার কথা বলে। প্রকাশ্য জনসভায় রাজনৈতিক নেতারা পদত্যাগ না করে দেহত্যাগের আহ্বান জানায়। জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠনের মুখে 'পঁচাত্তরের হাতিয়ার গর্জে উঠুক আরেকবার' এই স্লোগানটি উচ্চারিত হতে শুনেছি। পৃথিবীর ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে অনুপ্রেরণা বুঝি একটি রাজনৈতিক দলই পেতে পারে– সাধারণ মানুষ সেটা কল্পনাও করতে পারে না।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের জনসভায় এই ধরনের অশালীন কথা বলে নিজেদের দলীয় কর্মীদের কাছ থেকে বিশাল বাহবা পেতে পারেন কিন্তু সেই তথ্য যখন খবরের কাগজের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে আসে তারা কিন্তু লজ্জায়-

ঘৃণায় ছিঃ ছিঃ করে ওঠেন– এই সত্যটি সবাইকে জানতে হবে। দেশের সবচেয়ে উচ্চাসনে আমরা কিছুতেই অসহিষ্ণু, অশালীন ও অভব্য ব্যবহার দেখতে চাই না, এটি কিছুতেই খুব বড় একটা দাবি হতে পারে না। এই ধরনের আচরণে তারা লজ্জা না পেতে পারেন কিন্তু আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

৩.

আমি নিশ্চিত, আমার এই লেখা পড়ে রাজনৈতিক নেতারা আমার নির্বুদ্ধিতা দেখে অট্টহাসি হাসছেন– এই দেশের রাজনীতি যে সহজ ভদ্রতা ভব্যতার স্তর পার হয়ে অনেক আগেই সন্ত্রাস এবং কালো টাকার স্তরে নেমে গেছে তারা সম্ভবত আমাকে সেটা মনে করিয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু আমি তবুও দেশের কোটি কোটি মানুষের মতো সেটা মেনে নিতে রাজি হব না– আমি ভাঙা রেকর্ডের মতো সুস্থ রাজনীতির মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে থাকব। গণতান্ত্রিক দেশে একটা বড় বিপর্যয় ঘটে গেলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ঘটনার দায়-দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেন। এ দেশে বোমা হামলার এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য পদত্যাগ দূরে থাকুক প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করা ছাড়া কার্যকর আর কিছু করা হয়েছে কি ? একটি বোমা হামলায় যত মানুষ মারা যায়, যত মানুষ পঙ্গু হয় প্রায় তার সমানসংখ্যক মানুষ প্রতিদিন বাস দুর্ঘটনায় মারা যায়। এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মৃত্যু নিয়ে যোগাযোগমন্ত্রী কি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা করেছেন, একটি বাক্য উচ্চারণ করেছেন ? রেল দুর্ঘটনা প্রায় রুটিন ব্যাপার হয়ে গেছে, মৌলবাদীরা ফিশ প্লেট তুলে একটা বড় ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটানোর পর যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। জায়গাটি কর্দমাক্ত ছিল এবং সম্ভবত তার জুতো এবং প্যান্ট ময়লা হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাকে কোলে করে সেখানে নেওয়া হয়েছিল। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষকে চাটুকাররা কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি আনন্দে হাসছেন– এই ছবিটি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আমি আমার জীবনে এর চেয়ে অশালীন কোনো ছবি দেখেছি বলে মনে করতে পারি না।

দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আমরা সবাই যেন মেনে নিয়েছি এই দেশের রাজনীতি হচ্ছে সন্ত্রাস, কালো টাকা, জোর-জবরদস্তি কিংব দল বদল। রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কাছাকাছি একটি ব্যাপার, তৃণমূল পর্যায়ে নেতারা কাজ করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতেন। নিজেদের একটা আদর্শ ছিল, এখন সেটা হয়ে গেছে ভোটের রাজনীতি। যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি ভোট আনতে পারবেন তিনিই হচ্ছেন নেতা– রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনো ব্যাপারই নয় যখন যার প্রয়োজন, যেভাবে খুশি দল বদল করে যাচ্ছেন, আমরা সবাই সেটা বেশ সহ্যও করে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষের নেতারা ছিটকে পড়ছেন, তাদের জায়গায় উড়ে এসে জুড়ে বসছেন আমলা, ব্যবসায়ী, উপাচার্য এবং জেনারেলরা। যে দলে সুবিধে সেই দলে যোগ দিচ্ছেন, আদর্শের কোনো ব্যাপার নেই। জাতীয় পার্টি চলে যাচ্ছে বিএনপিতে, জামায়াতে ইসলামী চলে আসছে আওয়ামী লীগে। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে কারো কোনো চক্ষুলজ্জা নেই– সবাই ধরেই নিয়েছে এটাই হচ্ছে রাজনীতি।

কিন্তু এটি রাজনীতি হতে পারে না। রাজনৈতিক নেতারা যতই চিৎকার করে বলুক না কেন যে রাজনীতিতে কোনো শেষ কথা নেই, আমরা সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নই। আমরা চাই রাজনীতিতে শেষ কথা থাকতে হবে, যে দল যে আদর্শের কথা বলবে তাকে সেই আদর্শের জন্য জীবনপণ করতে হবে, নিজের সুবিধার জন্য তারা দল ত্যাগ করতে পারবেন না, আদর্শ ত্যাগ করতে পারবেন না। যদি কেউ করেন তাদের জন্য আমাদের ভেতরে ঘৃণা এবং ধিক্কার ছাড়া আর কিছু নেই।

৪.

স্বাধীনতার পর ৩০ বছর পার হয়ে গেছে। পঁচাত্তরের পর এই '৯৬ সাল থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এর মাঝে দুই তৃতীয়াংশ সময়, প্রায় কুড়ি বছর, এই দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, চেতনা এবং গৌরবকে অবহেলা করা হয়েছে। ইতিহাস বইয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী না বলে হানাদার বাহিনী বলা হতো, রাজাকার কথাটি মুখে আনা হতো না, মুক্তিযুদ্ধকে বোঝানো হতো ঘটনাক্রমে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা, পাকিস্তানকে ভাঙার ভারতীয় পরিকল্পনায় একটা সাময়িক 'গোলমাল'। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একটিবারও বঙ্গবন্ধুর নামটিও উচ্চারিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আড়াল করে রাখা হলে ধীরে ধীরে তার আবেদন এবং তীব্রতা কমে আসবে বলে একটা প্রচলিত বিশ্বাস নিশ্চয়ই কাজ করছিল।

কিন্তু ইতিহাসের নিজের একটা গতি আছে, তাই একেবারে হিসেব করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবহেলা করার পরও তার আবেদন কমেনি। একাত্তরের নয় মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানুষিক নৃশংসতার কথা গোপন রাখা হয়েছে বলে ক্রিকেট মাঠে 'ম্যারি মি আফ্রিদি' বলার মতো একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হয়েছে সত্যি কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে তাদের জীবনের সবচেয়ে আদরে লালিত স্বপ্ন হিসেবে ধারণ করে রেখেছে। এই দেশে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে কোনো শক্তি আর বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে যাওয়ার আগে তাদের এতদিনের গুরু গোলাম আযমকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে ফেলেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হলে যে-বিএনপি জাতিকে বিভক্ত করার কুযুক্তি প্রদর্শন করে, তারাই ক্ষমতায় গেলে 'মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়' তৈরি করার কথা ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা 'মুক্তিযোদ্ধা মহাসম্মেলন' করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সারা দেশের সকল মানুষের যুদ্ধ, আওয়ামী লীগ করে না এ রকম অনেক দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা আছেন, কাজেই বিএনপি চাইলে এ রকম একটি মহাসম্মেলন করতে পারে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সম্মেলনের জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। যত বেশি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্পৃক্ত করা যাবে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা কী বলবেন সেটা শোনার জন্য আমি অবশ্যি খুব কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করেছি। মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর পৈশাচিক নির্যাতনের প্রিয়জন হারায়নি এ রকম মুক্তিযোদ্ধা তো একজনও নেই– তারা নির্বাচনী সহযোগীদের কথা কী বলবেন?

কাজেই এটা খুব আশার কথা যে, চেষ্টা করার পরও সচেতন মানুষ, ছাত্র, শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং জাহানারা ইমামের মতো ব্যক্তিত্বদের আন্তরিকতার কারণে দেশের সাধারণ মানুষের বুকের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বেঁচে আছে। সেই চেতনা এত গভীরে প্রোথিত যে, নির্বাচনে ভোট চাইবার আগে সবাইকে সেই চেতনার কথাটি মুখে অন্তত উচ্চারণ করতে হয়। এই দেশের জন্য এটি একটি মস্তবড় অর্জন।

৫.

আমাদের এখন আরো একটি অর্জনের সময় এসেছে, সেটা হচ্ছে রাজনীতি ব্যাপারটিতে সম্মান ফিরিয়ে আনা। এটা কীভাবে হবে আমার জানা নেই। রাতারাতি সব রাজনৈতিক নেতা সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিবেকবান হয়ে যাবেন সেটা আমরা আশা করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা জোর গলায় সেটা চাইতে পারি। দল বদল করা মৌসুমী নেতা নয়– সাধারণ মানুষের মাঝখান থেকে উঠে আসা তৃণমূল পর্যায়ের ত্যাগী নেতাদের চাই, যাদের এই দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা আছে। যারা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেবেন, তাদের মাঝে আমরা কোনো শর্টকাট মেনে নেব না। রাজনীতির মাঝে নীতিটুকু ফিরিয়ে দিতেই হবে।

প্রথম আলো

২৮ জুন ২০০১

উল্লাস কিংবা ক্রোধ নয়– কষ্ট

১.

স্টেশনে ট্রেনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় পাঁচ-ছয় বছরের একটা শিশু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার ন্যাড়া মাথা, খালি গা এবং কোমর থেকে কোনোমতে একটা প্যান্ট ঝুলে আছে। এই বয়সেই মানুষের সমবেদনা পাওয়ার নিয়ম কানুনগুলো সে ভালোভাবে শিখে গেছে। মাথাটা একটু কাত করে একটা হাত বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রেখে অন্য হাতটি আমার সামনে মেলে ধরে 'ভাত খাওয়ার' জন্য একটি টাকা চাইল। শিশুটি গোলগাল এবং নাদুসনুদুস, পেটটা প্রায় ফুটবলের মতো গোল– ভাত খাওয়ায় টান পড়েছে সেরকম কোনো চিহ্ন নেই। তবে ছোট একটা শিশুর কাতর একটা মুখের সামনে এরকম যুক্তিতর্ক খাটে না– আমি মানিব্যাগে হাত দিয়ে দেখলাম সেখানে খুচরো টাকা নেই। একটু দ্বিধা করে বড় একটা নোটই তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম, 'যাও এটা ভাঙিয়ে নিয়ে এসো, সেখান থেকে দেব।'

আমার আশপাশে যারা ছিলেন, তারা হা হা করে উঠলেন কিন্তু কিছু বোঝার আগেই শিশুটি ছো মেরে আমার হাত থেকে নোটটি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠজনের মাঝে আমি বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত নই, তাতে আমি কিছু মনে করি না। আজকে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপরিচিত মানুষেরাও আমার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানারকম সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

এরকম সময়ে ঘোষণা দেওয়া হলো ট্রেনটি নির্ধারিত এক নম্বর লাইনে না এসে দু নম্বর লাইনে দাঁড়াবে, কাজেই আমরা সবাই আমাদের মালপত্র টানাটানি করে দু নম্বর প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। টাকার ভাঙতি নিয়ে এলেও শিশুটির আর আমাকে খুঁজে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকল না। অর্থদণ্ড হলেও আমার হয়েছে কিন্তু আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন কোনো একটি বিচিত্র কারণে আমার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হলেন।

অনেক সময় কেটে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেন এসেছে। আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে নিজেদের কামরা খুঁজে ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি এরকম সময়ে দেখতে পেলাম ন্যাড়া মাথা এবং খালি গায়ের সেই নাদুসনুদুস শিশুটি তার মুষ্টিবদ্ধ হাতে অনেকগুলো খুচরো টাকা শক্ত করে ধরে রেখে আমার কাছে ছুটে এসেছে। তার মুখে একটা উদ্বেগের চিহ্ন– আমাকে শত শত মানুষের মাঝে খুঁজে পেয়ে সেখানে রাজ্য জয় করার আনন্দ ফুটে উঠল। কিছুই হয়নি এবং এটাই স্বাভাবিক– সেরকম ভঙ্গি করে আমি তার হাত থেকে জীর্ণ নোটগুলো নিয়ে তার কাছে দেওয়া, অঙ্গীকার মাফিক তার টাকা বুঝিয়ে দিলাম। সে জানাল নোটটি ভাঙাতে তার বিস্তর সমস্যা হয়েছে এজন্যই দেরি হয়ে গেছে। আমি মুখে প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য ধরে রেখে তার ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম।

এটি অত্যন্ত তুচ্ছ এবং সাধারণ একটি ঘটনা এবং এরকম ঘটনা সব সময়ই ঘটছে। এখন পর্যন্ত একবারও হয়নি যেখানে আমি একটি মানুষকে বিশ্বাস করেছি এবং

সেই মানুষটি তার জবাবে আমাকে ঠকিয়ে গেছে। ধুরন্ধর মতলববাজ মানুষ পরিকল্পনা করে আমাকে ঠকিয়ে যায়নি তা নয়, কিন্তু আমি যাদের বিশ্বাস করেছি তাদের কেউ আমার বিশ্বাসের অমর্যাদা করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং খানিকটা ঘরকুনো মানুষ বলে আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাই না। আজকাল ট্রেনে অনেক যাতায়াত করি বলে স্টেশনের শিশু-কিশোর অনেক হকারকে আমি চিনি। কয়েকদিন আগে এরকম একজন হকারের কাছ থেকে একটি খবরের কাগজ কিনে তাকে আমি ১০ টাকার একটি নোট দিয়েছি। সে যখন ভাঙতি ফেরত দিচ্ছে আমি তখন তাকে উদাস গলায় বললাম, 'ফেরত দিতে হবে না, বাকিটা রেখে দাও।'

ছেলেটি জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'কখনো দেখেছেন আমি আপনার কাছ থেকে বেশি রেখেছি?'

সত্য কথা। বাম হাত কনুইয়ের পর থেকে কাটা এই শিশুটিকে অনেক চেষ্টা করেও আমি সঠিক মূল্য থেকে বেশি দিতে পারিনি। সে কারো অনুগ্রহ নেয় না, তার মর্যাদাবোধ আমার মর্যাদাবোধ থেকে এক তিল কম নয়। বহুদিন আগে আমি হাতকাটা এক কিশোরকে নিয়ে একটি কাল্পনিক গল্প লিখেছিলাম– এই জীবন্ত চরিত্রের কাছে আমার সেই কাল্পনিক চরিত্র ম্লান হয়ে আছে।

কাজের ক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় বলে আমার মেলামেশার ৯০ ভাগই হচ্ছে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের নিয়ে, সেখানেও আমার কোনো অভিযোগ নেই। সেদিন ক্লাসে টার্ম টেস্টের খাতা ফেরত দিয়েছি, টেস্টের প্রশ্নগুলো নিয়ে কথা বলতে বলতে ক্লাসের সময় ফুরিয়ে গেছে। আমি চক-ডাস্টার গুছিয়ে নিজের রুমে ফিরে আসছি– তখন একজন ছাত্রী পেছন থেকে কুণ্ঠিত গলায় আমায় ডাকল। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই সে বলল, আমি নাকি তার টার্ম টেস্টের খাতায় নম্বর দিতে ভুল করেছি।

আমার কাজকর্মে নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থাকে, চেষ্টা করেও সব সময় শুধরে নিতে পারি না, একটু অপ্রস্তুত হয়ে খাতাটি হাতে নিয়ে বললাম, 'কোনটিতে মার্ক দিই নি?'

'সবগুলোতে দিয়েছেন।'

'তাহলে?'

'যোগে ভুল করেছেন স্যার। ১০ নম্বর বেশি দিয়ে দিয়েছেন।' আমি নম্বর যোগ করে দেখলাম সত্যিই তাই। মুখের মাংসপেশিকে বিন্দুমাত্র শিথিল না করে কোনোরকম ভাবাবেগ ছাড়াই ঘ্যাচ করে তার বাড়তি নম্বর কেটে দিয়ে তার খাতা তাকে ফিরিয়ে দিলাম, মানুষের সততা দেখে দেখে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

আমার জীবনে আমি যে খারাপ মানুষ দেখিনি তা নয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, রাজাকার-আলবদর আর জামায়াতে ইসলামীর অনেক নৃশংসতা দেখেছি। মৌলবাদীরাও আমার ওপর কম অত্যাচার করেনি। কিছু দিন আগেও মসজিদে মসজিদে তারা আমার বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছে, কিন্তু তারা আমার কাছাকাছি মানুষ নয়, তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় না। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়, যোগাযোগ হয় সে যত সাধারণ বা তুচ্ছ মানুষই হোক, তাদের সততা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। দেশের এই সাধারণ মানুষগুলোর সঙ্গে একটি জীবন পার করে দেওয়ার কথা চিন্তা করে আমি আনন্দে উদ্বেলিত হই।

তাহলে কেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো আমার চারপাশের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ ? কেন বলা হলো আমরা সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ জাতি ?

২.

কেন বলেছে সেটি আমরা জানি। আমাদের চারপাশের সাদাসিধে, সহজ-সরল খেটে খাওয়া পরিশ্রমী মানুষের বাইরে ক্ষমতাশালী, শক্তিধর ও কৌশলী কিছু মানুষ আছে, তাদের বড় অংশ বিবেক এবং নীতিহীন। তাদের সেই দুর্নীতির দায়ভার নিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে। সম্ভবত বাংলাদেশ পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে পুলিশরা ডাকাতদের পাশাপাশি থেকে দল বেঁধে ডাকাতি করে (প্রথম আলোর খবর), বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করে ফেলে, মাসিক মাসোহারা নষ্ট হয়ে যাবে বলে অপরাধীদের লালন করে এবং এর সবকিছুর মাঝে পুলিশের প্রধান বলেন, এই দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। এই দেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে না গিয়ে সন্ত্রাসীদের কাছে যান, তাদের জন্য একে-৪৭ রাইফেল কিনে আনেন। এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু ছাত্র বহিষ্কার করা হয় না, সমান হারে শিক্ষকদেরও বহিষ্কার করা হয়। মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা দেশের বড় বড় ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের ছেলেরা মানুষ খুন করেও আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকেন। বিরোধী দল হরতাল ডেকে এক-দুজন রিকশাওয়ালা বা টেম্পোচালককে পুড়িয়ে না মারা পর্যন্ত হরতালটি সফল হয়েছে বলে মনে করেন না। শুধু খবরের কাগজে ছাপা হওয়া দুর্নীতি, অবিচার আর নৃশংসতার তালিকা যদি তৈরি করি সেই তালিকা দেখে ঘেন্নায়, বিতৃষ্ণায়, রাগে-দুঃখে, অপমানে, যন্ত্রণায় এবং হতাশায় যেকোনো মানুষ বমি করে দেবে।

কিন্তু যেই মানুষগুলোর জন্য আমাদের এই দুর্দশা তাদের সংখ্যা কত ? আমার হিসাবে অত্যন্ত কম, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী, লোভী, অসৎ, চরম দুর্নীতিপরায়ণ, হিংস্র ও বিবেকহীন মানুষের সংখ্যা সম্ভবত ১০০ ভাগের এক ভাগও নয়। অত্যন্ত নৈরাশ্যবাদী হলে বলব দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে লোভী, সামাজিক চাপে অপরাধী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি হলে হয়তো দেশের শতকরা ৫ ভাগ মানুষ কিন্তু দেশের বাকি ৯৫ ভাগ মানুষ নিশ্চয়ই সৎ, তাহলে এই ক্ষুদ্র একটা অংশের জন্য দেশের বাকি মানুষ কেন এতবড় একটা অপবাদ মাথা পেতে নেবে ?

অন্যদের কথা জানি না, আমি কখনোই সেটা মাথা পেতে নিতে রাজি নই। বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার খবর শুনে আমি যেটুকু ধাক্কা খেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক বড় ধাক্কা খেয়েছি তার প্রতিক্রিয়াটি দেখে। বিএনপি এবং তাদের সহযোগী দলগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল উল্লাসের, সেই উল্লাস গোপন রাখা নিয়েও তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। মিটিং-মিছিল, আলোচনা-বিবৃতি সব জায়গায় তারা এই তথ্যটি টেনে এনেছেন। বাংলাদেশের এই দুর্নামটুকুর জন্য যে তৎকালীন সরকার দায়ী সেটা তারা সগৌরবে এবং সোল্লাসে প্রচার করেছেন, তারা ক্ষমতায় গেলে যে রাতারাতি পুরো দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করে ফেলবেন সেই কথাটিও খুব জোরগলায় ঘোষণা দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াটি ছিল ক্রোধের। তারা প্রচণ্ড ক্রোধে সেই পরিসংখ্যানটুকু প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে কেস করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। ট্রান্সপারেন্সি. ইন্টারন্যাশনালের আসল লোকজনকে না পেয়ে এই দেশে যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের ওপর মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

৩.

বাংলাদেশ সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে প্রচারিত হওয়ার খবরে যারা উল্লাসিত হয়েছিলেন তাদের উল্লাসের কারণ এই তথ্যটুকু ব্যবহার করে নির্বাচনের মৌসুমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা। যারা ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন তাদের ক্রোধের কারণও এক। নির্বাচনের সময় এই তথ্যটুকু তাদের না সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অল্প কিছু মানুষের উল্লাস এবং ক্রোধের বাইরেও দেশের মানুষের মনে আরো একটি অনুভূতি কাজ করেছিল, সেই অনুভূতিটি ছিল কষ্টের। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনে আমরা সেই অনুভূতির খোঁজ পাইনি। কারণ দেশের সাধারণ মানুষ যারা সেই অনুভূতিকে বুকে ধারণ করেন তাদের মনের কথা খবরের কাগজে লেখা হয় না। দেশের জন্য ভালোবাসা রয়েছে, খেটে খাওয়া সেই সাধারণ মানুষ যারা শরীরের ঘাম দিয়ে তিল তিল করে দেশটাকে গড়ে তুলছে তাদের অনুভূতিটি ছিল কষ্টের।

যারা বুকে সেই কষ্ট পুষে রেখেছেন আমার এই লেখাটি তাদের জন্য।

৪.

একটা দেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া যায় কিনা সেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হচ্ছে– আগেও এ ধরনের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের নাম সবার ওপরে (নেতিবাচক অর্থে) আসেনি বলে আমরা সেটা নিয়ে বিতর্ক তুলিনি। আমার ধারণা এই তালিকাগুলো এসএসসি পরীক্ষায় মেধাতালিকার মতো। যে ছেলে বা মেয়েটি এই মেধাতালিকায় একেবারে প্রথম হয়ে যেত তারা যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু যে ছেলেটির নাম তালিকার প্রথমে আসেনি কিন্তু প্রথম বিশ-ত্রিশ বা পঞ্চাশের মধ্যে আছে সেও কিন্তু একেবারে প্রথম হয়ে যাওয়া ছাত্র থেকে কোনো অংশে কম নয়। (এসএসসির ফলাফল দেওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন করে এই বৈষম্যের অনেকটুকু এক ধাক্কায় দূর করে দেওয়া গেছে।) সেরকম দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম এর আগে একেবারে প্রথমে হয়তো কখনোই আসেনি, কিন্তু বারবারই প্রথম দিকেই ছিল– যার অর্থ এই দেশে খুব বড় ধরনের দুর্নীতি অনেকদিন থেকেই আছে।

মেধাতালিকার প্রথম ২০–৩০ বা ৫০ জন ছেলেমেয়েই কাছাকাছি মেধাবী জানার পরও আমরা যেরকম একেবারে প্রথম হয়ে যাওয়া ছেলে বা মেয়েটিকে নিয়ে বেশি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি, সে কী হতে চায়, কার লেখা পছন্দ করে, তার কাছে আদর্শ মানুষ কে, কোন ক্রিকেট টিম তার ফেবারিট এসব জানতে চাই– এখানেও সেই একই ব্যাপার। দুর্নীতির তালিকায় একেবারে শীর্ষে উঠে যাওয়ার পর আমাদের কৌতূহলটাও অনেক বেড়ে গেছে। ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে কারা অবদান রেখে আমাদের মুখে লজ্জার

গ্লানি মাখিয়েছে এবং ঠিক কী পদ্ধতিতে সেই তালিকা তৈরি হয়েছে, সেটা জানার জন্য আমাদের সবার আগ্রহ।

পদ্ধতিটি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পদ্ধতিটিতে অত্যন্ত বড় ধরনের ত্রুটি আছে। ২৭ জুলাই প্রথম আলোতে এ জেড এম আবদুল আলী খুব গুছিয়ে এর ওপরে একটি লেখা লিখেছেন যেটা পড়ে আমার চোখ খুলে গেছে। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের দুর্নীতির পরিমাপ করতে গিয়ে যে সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার ভেতরে এত বড় অসামাঞ্জস্য রয়েছে যে, পরিসংখ্যানের প্রচলিত বিজ্ঞানের হিসাবে বাংলাদেশের দুর্নীতি সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করা দুঃসাধ্য। বিষয়টি এত গুরুতর যে, দি ইকোনমিস্ট পত্রিকাটি দুর্নীতির তালিকায় বাংলাদেশের নামটি রাখেনি– সর্বশেষ নামটি হচ্ছে নাইজেরিয়ার। এ ধরনের আরো উদাহরণ আছে, যেখানে বাংলাদেশের নামটি রাখা হয়নি। কেউ যেন মনে না করে এর অর্থ দুর্নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধোয়া তুলসি পাতা। এর অর্থ বাংলাদেশ দুর্নীতির কোন পর্যায়ে সেটা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।

এ ধরনের একটি অভিযোগ সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া করেছিলেন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অভিযোগ সাধারণ মানুষ গুরুত্ব দিয়ে নেয় না, কিন্তু দি ইকোনমিস্ট পত্রিকার বিবেচনাটি তো খানিকটা গুরুত্ব দিয়ে নিতে হয়– বিশেষ করে আমরা যখন জানি বাংলাদেশ সম্পর্কে অসম্মানজনক কথাবার্তা বলা পশ্চিমা সাংবাদিকদের একটি প্রিয় বিষয়, তারা এত সহজে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তালিকায় চাকু চালাতেন না।

এবার তাহলে বাকি থাকল আমার অত্যন্ত সোজা একটি প্রশ্ন। যে তথ্যে এত অসঙ্গতি সেই তথ্য ব্যবহার করে কেন এরকম একটি দায়িত্বহীন মন্তব্য করা হলো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আন্তর্জাতিক একটা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় মানুষজনকে আমরা কখনো খুঁজে পাব না। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথাও নেই। কিন্তু ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বাংলাদেশ অধ্যায়ের কর্মকর্তাদের আমরা সহজেই পেতে পারি– সত্যিকথা বলতে কি, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে। মফস্বলে না থেকে ঢাকা শহরে থাকলে তাদের সঙ্গে আমার এর মাঝে কয়েকবার দেখা হয়ে যেত। তারা সারা দেশের কাছে সম্মানী ব্যক্তি– আমি জানি তারা তাদের দায়িত্বটুকু পরিপূর্ণ আন্তরিকতা এবং সততার সঙ্গে করেছেন, কাজেই তাদের অংশটুকুও আমার জানার খুব আগ্রহ। দি ইকোনমিস্ট যে তথ্যটুকু গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, তারা সেই তথ্য কেন গ্রহণ করে প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন? যদি এটি তাদের অজ্ঞাতে হয়ে থাকে তাহলে কি সেটি নিয়ে তারা প্রতিবাদ করেছেন? যদি প্রতিবাদ না করে থাকেন তাহলে কেন করছেন না? যদি করে থাকেন তাহলে তার উত্তরে কী বলা হয়েছে? প্রতিষ্ঠানটির নামই হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল– এর কাছে আমরা যদি স্বচ্ছতা দাবি না করতে পারি তাহলে কার কাছে করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এর উত্তর হয়তো পেয়ে যাব কিন্তু দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম দেখে এই দেশের লাখ লাখ শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণী মনে যে কষ্ট পেয়েছে তাদের মনের কষ্ট দূর করে

ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়ার দায়িত্বটি কি তারা নেবেন না! 'আমাদের খুব বড় ভুল হয়ে গেছে' কথাটি উচ্চারণ করা কি খুব কঠিন?

৫.

দেশে স্থায়ী হওয়ার আগে আমি বহুদিন দেশের বাইরে ছিলাম এবং যতদিন দেশের বাইরে ছিলাম একদিনও দেশ, দেশের মানুষ বা দেশের সরকারের সমালোচনা করে একটি লাইনও লিখিনি। আমার মনে হতো দেশের দুঃখ-কষ্টের অংশীদার না হয়ে তার সমালোচনা করার অধিকার আমার নেই।

দেশে ফিরে এসে আমি মনে করি আমার সেই অধিকার হয়েছে। আজকাল কোনো বিষয় আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুললে আমি আমার মনের দুঃখ, কষ্ট, ক্রোধ, ক্ষোভ, লজ্জা, অপমান (এবং অনেক সময় আনন্দ ও উল্লাসের কথাও) লিখে ফেলি। লিখতে গিয়ে এই দেশের অত্যন্ত সম্মানী এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে নিয়েও কঠিন এবং রূঢ় বাক্য উচ্চারণ করে ফেলি কিন্তু তাদেরকে নিজের মানুষ বা প্রতিষ্ঠান বলেই করি।

আবার বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টটি হাতে নিয়ে যখন ভিন্ন দেশের কুটিল এবং সন্দেহপ্রবণ ইমিগ্রেশান পার হয়ে সেই দেশে ঢুকি তখন এই সবুজ পাসপোর্টের দেশটির জন্য মন কেমন কেমন করতে থাকে। দেশের সব দীনতা, হীনতা, নীচতা ফেলে রেখে তখন দেশটির শুধু উজ্জ্বল অংশটুকুই সবাইকে দেখাই। বছর দেড়েক আগে জার্মানিতে গিয়ে এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষদের সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তাদের একটি আপত্তিকর প্রশ্নের উত্তরে চটে গিয়ে এমনভাবে বাংলাদেশের অর্জনের কথা বলতে শুরু করলাম যে, প্রশ্নকর্তা ভদ্রলোক একেবারে হকচকিয়ে গেছেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, আওয়ামী লীগের কোনো নেতাও এত জোর দিয়ে তাদের অর্জনের কথা কাউকে বলেনি! আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমাদের দেশ সম্পর্কে আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, এখন ধারণা ভাঙল!'

আমি মনে মনে বললাম, তোমার হয়তো আগেই ঠিক ধারণা ছিল, হয়তো এখনই ভুল ধারণা দিয়ে গেলাম! কিন্তু সেজন্য আমার কোনো লজ্জা নেই। আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সামনে এই দেশটিকে একটি সম্মানজনক অবস্থানে নেওয়ার সময় হয়েছে, দেশকে নিয়ে অহঙ্কার করার অনেক কারণ আছে, সেগুলো জোর গলায় বলার প্রয়োজন রয়েছে– দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে।

এই দেশ এখন নতুন প্রজন্মের– শুধু তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে, দেশের সাধারণ মানুষ এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ মানুষদের একজন। দেশটাকে যারা দুর্নীতির শীর্ষে নিয়ে যেতে চাইছে এই দেশে বেঁচে থাকার তাদের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। হাতে গোনা অল্প কিছু মানুষের জন্য দেশের বাকি ১৩ কোটি মানুষ কিছুতেই লজ্জা এবং অপমান নিজেদের মুখে লেপন করতে রাজি হব না।

প্রথম আলো

৪ আগস্ট, ২০০১

আহমদ ছফা এবং বাংলা একাডেমী পুরস্কার

খবরের কাগজের পেছনের পৃষ্ঠায় আহমদ ছফার ছবি দেখে আমি কৌতূহলী চোখে খবরটির দিকে তাকিয়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলাম– ছফা ভাই মারা গেছেন। খবরটি নিজের চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হলো না। আমার মনে হতে লাগল খবরটি ভুল, নিশ্চয়ই কোথাও ফোন করলে জানা যাবে অন্য কেউ মারা গিয়েছে। ছফা ভাই ভালো আছেন। ছফা ভাই এভাবে হঠাৎ করে মারা যেতে পারেন না। যতবার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়েছি আমার মনে হয়েছে ছফা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে যাই– বেশ অনেকদিন দেখা হয়নি, পরেরবার যাব বলে পরিকল্পনা স্থগিত করেছি কিন্তু এখন কী হবে ? তাঁর সঙ্গে যে আর কোনো দিনই দেখা হবে না। ছফা ভাই সত্যি সত্যি মারা গিয়েছেন খবরটি আত্মস্থ করার পর হঠাৎ করে আমার পরিচিত পৃথিবীটি অন্য রকম দেখাতে শুরু করে। সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন মনে হয়।

বছর কয়েক আগে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আজিজ সুপার মার্কেটের ওপর তলায় গিয়েছিলাম, আমি ছেলেকে বলেছিলাম যে তাকে আমি একশ ভাগ খাঁটি একজন সাহিত্যিক দেখাব। ছফা ভাইয়ের ঘরটিতে গিয়ে দেখি তিনি মাথার নিচে কয়েকটা বই দিয়ে একটা বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করল না, আমি আমার ছেলেকে ফিসফিস করে বললাম, 'এই যে মানুষটা দেখছো তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হচ্ছে একজন সত্যিকার সাহিত্যিকের।' আমার ছেলে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, একজন সত্যিকারের সাহিত্যিক কি দোকানের মতো একটা ঘরে কিছু বইকে বালিশ বানিয়ে সিগারেটের টুকরো, খালি চায়ের কাপ আর কাগজের স্তূপের মাঝে শুয়ে থাকে ? আমি আমার ছেলেকে বললাম, 'পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক আছে, সফল সাহিত্যিক আছে, জনপ্রিয় সাহিত্যিক আছে কিন্তু একেবারে একশ ভাগ খাঁটি সাহিত্যিক খুব কম। তোমার কত বড় সৌভাগ্য যে তুমি আজকে একজনকে দেখতে পেলে।' আমি ছফা ভাইকে ঘুম থেকে তুলিনি– এখন মনে হচ্ছে কেন তুললাম না।

২.

আমি যখন ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি তখন একেবারেই ক্লাস করতে ইচ্ছে করত না। দুপুরবেলা থেকেই পাবলিক লাইব্রেরি এসে গল্পবই পড়তে বসে যেতাম। পাবলিক লাইব্রেরিতে পশ্চিম বাংলার লেখকদের পাশাপাশি আমাদের দেশের একেবারে হাতেগোনা যে দু-একজন লেখক ছিলেন তাদের মাঝে একজনের নাম আহমদ ছফা। সেই যুগে বই ছাপানো এত সহজ ছিল না– ছাপার যোগ্য না হলে কেউ বই ছাপাতো না। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আহমদ দফার বই পড়ে শেষ

করলাম। কারো বই পড়লেই আমাকে চোখের সামনে সেই লেখকের একটা ছবি ভেসে ওঠে। এবারেও তাই হলো, ধারণা হলো আহমদ ছফা মানুষটি লম্বা চওড়া এবং মাথায় ঝাকড়া চুল এবং গমগমে কণ্ঠস্বর। লেখকদের আমি কখনো চোখে দেখিনি– দেখা সম্ভব সেরকম ধারণাও ছিল না। তাই কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ করে এই দেশে মুক্ত দেশের মুক্ত সংস্কৃতির ঝকঝকে একটা আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ল। তরুণ লেখক-কবি-শিল্পীদের আমরা দেখতে শুরু করলাম। আমার অগ্রজ হুমায়ূন আহমেদ 'নন্দিত নরকে' নামে একটি উপন্যাস লিখেছে, খবর পেলাম আহমদ ছফা সেটাকে বই হিসেবে ছাপানোর চেষ্টা করছেন। মুহসীন হলে হুমায়ূন আহমেদের রুমে আমার একদিন আহমদ ছফার সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। তাকে দেখে অবশ্যি আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল, আমার কল্পনার সঙ্গে কোনো মিল নেই। মানুষটি ছোটখাটো, এলোমেলো চুল, চৌদ্দ বছরের কিশোরের মতো চেহারা এবং কথা বলেন অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে। ভুরু দুটি বেশির ভাগ সময়েই বিস্ময়ের ভঙ্গিতে ওপরে তুলে রাখেন, কথা বলেন আনুনাসিক স্বরে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। একটি দুটি বাক্য বলে হঠাৎ করে মুখ সুঁচালো করে গম্ভীর হয়ে যান। সম্পূর্ণ বিনা কারণে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ছোট বাচ্চাদের মতো হাসতে শুরু করেন। মানুষটি কে জানা না থাকলে তাকে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ ভাবা এতটুকু অস্বাভাবিক নয়। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে প্ল্যানচেট করে মৃত আত্মাদের টানাটানি করে খানিকটা নাম কামিয়েছি, ছফা ভাই সেই বিষয়টা জানার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার কাছে পুরোটুকু শুনে হাত নেড়ে পুরো পারলৌকিক জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দুর! জীবন্ত মানুষের সমস্যা নিয়েই বাঁচি না– এখন আবার মৃত আত্মার সমস্যা!'

এক কথায় এ রকম গুরুতর বিষয়কে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেখে আমি চমৎকৃত হলাম। লেখক আহমদ ছফাকে আগেই পছন্দ করেছি, মানুষ ছফা ভাইকে আমার আরো বেশি পছন্দ হলো।

তখন সবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধের সময় আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে, পুরো পরিবারের খুব দুঃসময়। শহীদ পরিবার হিসেবে সরকার থেকে আমাদের একটা বাসা দিয়েছিল। একদিন রক্ষীবাহিনী এসে আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে দিয়ে একেবারে আক্ষরিক অর্থে পথে নামিয়ে দিলো। আমরা তখন জগৎসংসারের জটিলতায় একেবারে অনভিজ্ঞ, সারা বাংলাদেশে আমাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তখন ছফা ভাই তার শুকনো পাতলা দেহ কিন্তু বিশাল একটি হৃদয় এবং সিংহের সাহস নিয়ে আমাদের পাশে এগিয়ে এলেন। সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে আমাদের পাশে কেউ একজন আছে সেই ভরসাটুকু যে কত বড় সেটা শুধু আমরাই জানি। বেঁচে থাকার দুঃসহ প্রচেষ্টার মাঝে থেকে ছফা ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠতা হলো, তিনি তখন প্রায় নিয়মিতভাবে আমাদের খোঁজ নিতে আসতেন। আমাদের মা-ভাইবোন সবার সঙ্গে তার খাতির। আমার মায়ের সঙ্গে তার খাতির সবচেয়ে বেশি। কারণ কীভাবে কীভাবে জানি তার

ধারণা হয়েছে যে আমার মা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। প্রথম প্রথম সহজ সহজ স্বপ্ন দেখে চলে আসতেন। ধীরে ধীরে তার স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করল। একদিন বাসায় এসে দেখি আমার মা বিপন্ন মুখে বসে আছেন এবং ছফা ভাই হাত-পা নেড়ে তার স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন, সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে হবে। স্বপ্নটি এরকম : গ্রামের বাসিন্দারা ছোট ছোট মানুষ। তাদের গায়ের রঙ কালো। সেই গ্রামে বড় বড় তেঁতুলগাছ। গ্রামের মানুষের সবার হাতে তেঁতুল বিচি। তারা তেঁতুল বিচি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে... ইত্যাদি ইত্যাদি! ছফা ভাইয়ের স্বপ্নের বর্ণনা শুনে আমরা হেসে গড়াগড়ি যেতাম এবং তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমার মা হিমশিম খেয়ে যেতেন।

যারা আমাদের বয়সী তারা জানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা শহর থেকে বস্তি তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, নিরাশ্রয় বিপন্ন মানুষের সে কী কষ্ট, সে কী হাহাকার। আমাদের যখন পথে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন ছফা ভাই আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কিন্তু এই হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষের জন্যে তিনি কী করবেন ? সেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বস্তি উজাড় নাম দিয়ে (সম্ভবত) একটা বিশাল কবিতা লিখে পরদিন আমাদের বাসায় হাজির। প্যান্ট খানিকটা গুটানো, খালি পায়ে আমাদের বাসার ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি সেই কবিতাটি আওড়াতে লাগলেন। বিশাল কবিতা, সেটা লেখার পর পুরোটা এরকম মুখস্থ বলে যাওয়া সম্ভব আমি না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। মানুষের আবেগ অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার, কে কীভাবে ব্যবহার করবে যেন বুঝতে পারে না, আমরা যেন সেটা লুকিয়েই রাখতে চাই কিন্তু ছফা ভাইয়ের মাঝে সেটা নিয়ে কোন লুকোছাপা ছিল না– নিজের আবেগটুকু প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা করতেন না। যখন রাগ হওয়ার কথা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন, যখন খুশি হওয়ার কথা আনন্দে শিশুর মতো উদ্বেলিত হতেন আবার যখন দুঃখ পেতেন হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলতেন।

ঠিক কী কারণ জানি না ছফা ভাই আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। আমার সঙ্গে দেখা হলেই তিনি আমাকে নানা জায়গায় নিয়ে যেতেন। তার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করার আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার কথা বলার ঢংটা আমার কাছে অসম্ভব চিত্তাকর্ষক মনে হতো। পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে কৌতুক না হয় বিদ্রূপ করতে পারতেন। সহজ একটা জিনিস নিয়ে এমন বিচিত্র উপমা টেনে আনতেন যে আমি হাঁ করে তার কথা শুনতাম। দেশের সকল বড় বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাঁর নিজের ঢংয়ে কথা বলতেন, না হয় ঝগড়াঝাঁটি করতেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজনীতি বা রাজনীতির মতো বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তখন আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না– আমি ছফা ভাইকে দেখেই মুগ্ধ। মনে আছে, একবার দেশের সব বড় বড় লেখকেরা একত্র হয়েছেন একটা সংগঠন করার জন্য। সেখানে ছফা ভাই হাজির হয়ে এমন তর্ক শুরু করে দিতেন যে একটু পরে দেখা গেল বড় বড় সেই লেখকেরা কোনো মতে তাদের প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। ছফা ভাই ঠিক কী কারণে দেশের বড় বড় লেখকদের ওপর চটে ছিলেন, লেখকদের সেই

সংগঠনটি ভণ্ডুল করে দেওয়ার কাজটি ন্যায্য হয়েছে কিনা এতদিন পরে আমার মনে নেই। কিন্তু ছফা ভাইয়ের তোপের মুখে তাদের কাঁচুমাচু মুখ দেখে সেদিন আমার খুব মায়া হয়েছিল।

আমাদের তখন বেশ অর্থকষ্ট– লুকিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করি। ছফা ভাই সম্ভবত আন্দাজ করেছেন, তাই আমাকে নিয়ে গেলেন দৈনিক গণকণ্ঠ অফিসে। সেখানে আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন– কার্টুনিস্টের কাজ। গণকণ্ঠ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি সেখানে কার্টুন আঁকতাম। রাজনৈতিক কার্টুন এঁকে সেই বয়সেই আমি অনেক শত্রু তৈরি করে ফেলেছিলাম।

একটা ঘটনার কথা বেশ মনে আছে। পুলিশ বিভাগ থেকে একবার আমাদের পরিবারের কাছে চিঠি এল– আমাদের কেউ যেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আমার বাবাকে নিয়ে কিছু লিখি, তারা তাদের একটি ম্যাগাজিনে ছাপাবে। আমি তাই বাবার ওপরে একটা লেখা দিয়েছি এবং সেটা ছাপাও হয়েছে। কীভাবে কীভাবে লেখাটি ছফা ভাইয়ের চোখে পড়েছে এবং মনে হলো সেটি তার ভেতরে দাগ কেটেছে। তার কয়দিন পর আমি আমার সাইকেল চালিয়ে মিরপুর রোড ধরে ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি, ছফা ভাই উল্টো দিক দিয়ে আসছেন, আমাকে দেখে চিৎকার করে হাত তুলে থামালেন। আমি কাছে যেতেই তিনি পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'নাও তোমাকে দিলাম।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন ?'

'তোমার লেখাটা পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। সেই জন্যে দিলাম!' বলে ছফা ভাই তার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে মুখ সুঁচালো করে আমার দিকে তাকালেন।

কারো লেখা পড়ে খুশি হয়ে যে তাকে এক টাকা বখশিস দেওয়া যায় আমি সেটা জানতাম না। ছফা ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পেরে আমি খুব মজা পেয়েছিলাম। তার সেই নোটটা বেশ কয়েকদিন খরচ করিনি– লোকজনকে দেখিয়েছি। আমাকে এক টাকা বখশিস দিয়ে যে রকম লেখালেখিতে উৎসাহ দিয়েছেন সেরকম অসংখ্য তরুণ লেখক-লেখিকাকে ছফা ভাই উৎসাহ দিয়েছেন– আমাদের পরিবারের আরো একজন, অগ্রজ হুমায়ূন আহমেদের কথা তো আগেই বলেছি।

৩.

ছিয়াত্তর সালে পিএইচডি করার জন্য দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ছফা ভাইয়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। প্রায় দুই দশক পরে দেশে ফিরে এসে আমি সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি। কিছুদিনের মাঝেই ছাত্ররাজনীতি নামক ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি টের পেতে শুরু করলাম। একদিন আমার এক ছাত্র গুলি খেলো– ঘটনাটা আমাকে খুব বিচলিত করলো। রাগে দুঃখে আমি ভোরের কাগজে একটা লেখা লিখলাম। কয়দিন পর হঠাৎ করে ছফা ভাইয়ের একটা চিঠি এসে হাজির, ঠিকানা জানেন না বলে খামের ওপর আন্দাজ করে অনেক কিছু লিখেছেন। চিঠিতে আমাকে লেখাটির জন্যে খুব প্রশংসা করে আমাকে তাঁর একটা উপহার

দেবেন বলে জানান। আমি ছফা ভাইয়ের লেখার বড় ভক্ত, বইমেলা ঘুরে ঘুরে তাঁর সব বই কিনে রেখেছি কিন্তু তাঁর নিজের হাতে দেওয়া উপহারের জন্যে সাগ্রহে বসে রইলাম। কয়দিনের মাঝেই তাঁর নিজের হাতে কিছু স্নেহার্দ্র বাক্য লেখা 'পুষ্পবৃক্ষ ও বিহঙ্গ পুরাণ' বইটি এসে হাজির হলো। আমি বইটি যত্ন করে তুলে রাখলাম– আমার সঙ্গে ছফা ভাইয়ের যোগাযোগ আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

এর পরেরবার আমি যখন ঢাকা গিয়েছি একবার সময় করে আজিজ সুপার মার্কেটে দোতলায় তাকে খুঁজে বের করলাম। আমাকে দেখে তিনি একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। চুল কমে এসেছে, যেটুকু আছে তাতে পাক ধরেছে, চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েছে এবং আগের থেকে একটু মোটা হয়েছেন কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন হয়নি। সেই একই রকম কথা বলার ভঙ্গি, কথা বলার মাঝে কৌতুক, বিদ্রূপ আর চাতুর্য। অনেক দিন পরে দেখা, কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, 'এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

আমাকে কয়েকটা ঘর দূরে নিয়ে গেলেন, সাটার টেনে প্রায় বন্ধ করে রাখা আছে, নিচে অল্প একটু খোলা। সিজদার ভঙ্গিতে উবু হয়ে আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে উঁকি দিলাম। ভেতরে প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ছিন্নমূল হতদরিদ্র শিশু মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কাগজে লেখালেখি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এরা কারা?'

ছফা ভাইয়ের মুখ একশ ওয়াট বাল্বের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, 'আমার ছাত্র। পরীক্ষা দিচ্ছে।'

তাঁর কাছে খবর পেলাম তিনি ছোট ছোট গরিব বাচ্চাদের স্কুল খুলেছেন, তাদের পড়াশোনা করাচ্ছেন। কোন বাচ্চাটির কী বিচিত্র প্রতিভা বলতে বলতে উৎসাহে এবং আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। কোনোদিন বিয়ে করেননি, নিজের সংসার নেই– এই শিশুগুলোই এখন তাঁর জীবনের বড় অংশ।

এরপর থেকে সময় হলেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, কখনো তাঁকে পেয়েছি কখনো পাইনি। যখনই পেয়েছি তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথা বলেছি। মনে আছে একবার তিনি সদ্য লিখে শেষ করা পুরো একটা কবিতার বই পড়ে শুনিয়ে ফেললেন।

ছাত্র রাজনীতির ওপর খবরের কাগজে আমার লেখা পড়ে ছফা ভাই উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু তিনি যখন দেখলেন আমি মোটামুটি একজন প্রফেশনাল কলাম লেখক হয়ে প্রায় নিয়মিতভাবে কলাম লিখতে শুরু করেছি তখন তিনি আমার ওপরে খুব বিরক্ত হয়ে উঠলেন। একদিন আমাকে আচ্ছামতো বকাবকি করে বললেন, 'তুমি একজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের কাজ করবে। এসব ছাইপাশ লেখা বন্ধ করো।'

আমি খানিকক্ষণ তার সঙ্গে তর্ক করে হাল ছেড়ে দিলাম। ছফা ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করে পার পেয়ে যাবে– সে রকম মানুষ বাংলাদেশে কতজন আছে?

ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমার শুধু ছফা ভাইয়ের এই কথাগুলো মনে হচ্ছে– এবং মনে হচ্ছে ছফা ভাই আসলেই ব্যাপারটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোর মাঝে এখন এক তুমুল

ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা। সেখানে আমরা যারা 'গভীর তত্ত্বকথা' লিখি তারা আসলে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোয় সাহায্য করি, তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ইগোতে এক ধরনের সুড়সুড়ি লাগে, তার বেশি তো কিছু নয়। কাজটি আসলেই ঠিক হচ্ছে না।

ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমি খুব কষ্টে আছি, তাকে বলা হলো না যে আমি তার কথাই শুনব বলে ঠিক করেছি। বিজ্ঞানের মানুষ যেটুকু পারি বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করব।

৪.

লেখালেখিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির কথা লিখতে হলে আমি সব সময় তার পুরো নাম সম্মানসূচকভাবে ব্যবহার করি, কিন্তু এই প্রথমবার আমি সেটা করতে পারি না। অনেক চেষ্টার পরও প্রতিবার আহমদ ছফা লিখতে গিয়ে ছফা ভাই লিখে ফেলেছি এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছি। আজকে আমি মানুষ ছফা ভাই নিয়ে লিখেছি, যদিও লেখার উদ্দেশ্য মননশীল লেখক চিন্তাবিদ কবি ঔপন্যাসিক দার্শনিক গীতিকার আহমদ ছফা। তিনি বেঁচে থাকতে সেটা নিয়ে কোনো মূল্যায়ন হয়নি, এখন হয়তো হবে। আমি তাঁর প্রকাশিত সব লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি এবং আমি জানি আমাদের বড় সৌভাগ্য তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান মানুষের জন্ম হয়েছিল। আমি এই দেশের নতুন প্রজন্মকে তাঁর সাহিত্যকর্ম পড়ে দেখতে অনুরোধ করব।

এইটুকু হচ্ছে আমার লেখার ভূমিকা। এবার আসল বক্তব্যে আসি।

৫.

বাংলা একাডেমী থেকে প্রতি বছর এই দেশের কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটি আহমদ ছফাকে কখনো দেওয়া হয়নি। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তাঁকে সেই পুরস্কার দেওয়া হলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করতেন– কিন্তু সেটি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল তাঁকে সেই সম্মান প্রদর্শন করা। বাংলা একাডেমীর পুরস্কার দেওয়ার পদ্ধতিটি কী আমার জানা নেই। কিন্তু আহমদ ছফার মতো উঁচু মাপের একজন লেখককে যদি বাংলা একাডেমী তার উপযুক্ত এবং প্রাপ্য সম্মানটুকু দিতে না পারে তাহলে আমার ভেতরে বাংলা একাডেমীর জন্যে বিশেষ সম্মানবোধ অবশিষ্ট থাকবে না।

বাংলা একাডেমীর প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, আহমদ ছফার সাহিত্যকর্মকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়ে হলেও আমাদেরকে একটি লজ্জা এবং অপমান থেকে মুক্তি দেওয়া হোক। তা না হলে ভবিষ্যতে যাঁরা এই পুরস্কার পাবেন তাঁরা দশজনের সামনে কেমন করে মুখ দেখাবেন?

১৮ আগস্ট ২০০১

প্রিয় আহীর আলম

আহীর আলম মারা গিয়েছে ব্যাপারটি আমার এখনো বিশ্বাস হয় না। তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প সময়ের কিন্তু তার মাঝেই এত চমৎকার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল যে আমি কিছুতেই তার মৃত্যুটিকে গ্রহণ করতে পারছি না। আমার ছোট ভাই যখন টেলিফোনে খবরটি জানিয়েছে তখন হঠাৎ করে মনে হয়েছে বুকের ভেতরে একটা অংশ শূন্য হয়ে গেছে। বারবার মনে হচ্ছে কেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, না হলেই তো সে খবরের কাগজে ছাপা হওয়া আরো একটি নাম হয়ে থাকত; আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না।

শুরুতেই বলে রাখছি, আহীর আলমের সৃজনশীলতাকে মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি টেলিভিশনের নাটক, সিরিয়াল বা ভিডিও মাধ্যমের সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই। ঘটনাক্রমে ব্যক্তিগত পরিচয় আছে এরকম দু-একজন শিল্পী ছাড়া কাউকে চিনি না। যেখানে থাকি সেখানে টেলিভিশন নেই বলে টেলিভিশনের নাটক, সিরিয়াল কিছু দেখা হয় না। আমার বেশ কিছু লেখালেখিকে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, পরিচালকদের অনেক অনুরোধ করার পরও তারা আমাকে সেই ভিডিও দেননি বলে নিজের লেখার নাট্যরূপও দেখতে পারিনি। (আহীর আলম একমাত্র ব্যতিক্রম, তার তৈরি 'প্রেত' হচ্ছে একমাত্র টিভি সিরিয়াল যেটি আমি দেখতে পেরেছি, কারণ সে কথা রেখে আমাকে প্রেতের ভিডিও দিয়েছে!) মাঝেমধ্যে কদাচিৎ যদি টেলিভিশনে কিছু একটা দেখি কখনো ভালো লাগে, কখনো ভালো লাগে না। যারা বোদ্ধা দর্শক তারা বুঝতে পারেন কেন ভালো লাগেনি– আমি বোদ্ধা নই বলে কারণগুলো ধরতে পারি না। কাজেই আহীরের সৃজনশীলতার মূল্যায়ন আমি করতে পারব না– তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাই শুধু বলতে পারব।

আমি আগেই বলেছি, 'প্রেত' নামে আমার লেখা একটি আধিভৌতিক বইকে টিভি সিরিয়াল করার ব্যাপারে আহীরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরিচয়ের একেবারে প্রথম দিকেই যে জিনিসটি আমাকে মুগ্ধ করেছে সেটি হচ্ছে তার প্রফেশনালিজম– একুশে টিভির পক্ষ থেকে একেবারে আনুষ্ঠানিক চুক্তি করা থেকে শুরু করে নাটকের স্ক্রিপ্ট দেখিয়ে নেওয়া, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন, চরিত্রদের পোশাক, সেট সম্পর্কে আলোচনা, কোনো কিছুই সে আমাকে না জানিয়ে করেনি। আমি সব সময় তাকে বলেছি আমি এর কিছু জানি না, কিছু বুঝি না কিন্তু সে তবুও থামেনি। আমি নিশ্চিত কেউ বিশ্বাস করবেন না যে প্রেত সিরিয়ালের সকল অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাঝে আমি শুধু হুমায়ূন ফরিদীকে চিনতাম! 'প্রেত' বইয়ে ব্ল্যাক আর্টিস্টদের উপাসনা সংক্রান্ত ব্যাপারটি কীভাবে করা যায় সেটি নিয়ে আহীরের খুব ভাবনা ছিল। সেগুলো নিয়ে বারবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে। ব্ল্যাক আর্টিস্টদের জন্য মন্ত্রগুলো কথাগুলো সে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে গেছে।

একজন মানুষ কোনো ব্যাপার নিয়ে যে এত সিরিয়াস হতে পারে, আমি আহীরকে না দেখলে জানতে পারতাম না।

আমি আহীরের কাছে খবর পেলাম সে প্রেত সিরিয়ালের শুটিং শুরু করেছে। কিছুদিন পরে খবর পেলাম শুটিং শেষ করে ফেলেছে। আরো কিছুদিন পর খবর পেলাম এডিটিং হচ্ছে– এত দ্রুত কেমন করে এত জটিল কাজ শেষ করতে পারে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমাকে একদিন সে ফোন করে জানাল প্রেতের প্রেস শো হবে– আমি যেন আসি। আমি সিলেটে থাকি বলে আসতে পারিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই পরিচিত সবাই আমাকে জানাল তারা রুদ্ধশ্বাসে প্রেত দেখার জন্য অপেক্ষা করছে। আহীর আলম শুধু যে সিরিয়ালটি তৈরি করেছে তাই নয়– তার প্রচারের জন্য চমৎকার একটি আয়োজন করেছে। টেলিভিশনে দেওয়ার আগেই সে আমাকে একটি ভিডিও দিয়ে গেছে, যদিও আমি সেটা দেখেছি পরে। এর মাঝেই লোকমুখে খবর পেলাম সিরিয়ালটি নাকি খুব চমৎকার হয়েছে। যারা দেখেছে তারা পরের পর্বগুলো দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

আমিও নিজে একদিন দেখার সুযোগ পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আহীর আলমের প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম– তার কারণটি এ রকম: আমাদের দেশের অভিনয়ের একটি স্টাইল আছে, টেলিভিশনের নাটকের চরিত্রগুলো মাথা নেড়ে, চোখ নাচিয়ে, অদৃশ্য কোনো একটি বস্তুর দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ কৃত্রিম, বাস্তবতাবর্জিত একটি ঢঙে কথা বলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা যেভাবে কথা বলি তার সঙ্গে নাটকের কথা বলার কোনো মিল নেই। (যারা বাংলা সিনেমা দেখেছেন তারা আবেগঘন একটি দৃশ্য দেখলে আমার আপত্তিটি কোথায় সেটা বুঝতে পারবেন!) আমি আহীরকে বলেছিলাম যদিও এই মিডিয়াটির উনিশ-বিশ কিছুই আমি বুঝি না কিন্তু চরিত্রগুলো যেন স্বাভাবিক গলায় স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে। আহীর আমার অনুরোধ রেখেছে, সে চেষ্টা করেছে প্রত্যেকটা চরিত্রকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলানোর। সবাই এত সুন্দর করে অভিনয় করেছে যে আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। আমার নিজের কলম দিয়ে লিখে মূল চরিত্রের ভালোবাসার মেয়েটিকে দূরদেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আহীর সেই দৃশ্যটি যখন টেলিভিশনে ফুটিয়ে তুলল তখন চরিত্রগুলোর কষ্টটুকু দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। যারা বোদ্ধা দর্শক তারা হয়তো এর খুঁটিনাটি আলোচনা করবেন, সার্থকতা-ব্যর্থতা যাচাই করবেন। আমি সাধারণ দর্শক, আনন্দ পাওয়া ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না– আমি আহীরের কাজ দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

এর মাঝে ছাড়াছাড়াভাবে আহীর আমার সঙ্গে অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। তাকে প্রেতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখে দিতে হবে। মজার ব্যাপার হলো প্রেত তৈরি করার আগেই সে আমার কাছে এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, সে কীভাবে কীভাবে জানি একেবারে একশ ভাগ নিশ্চিত ছিল 'প্রেত' দর্শকনন্দিত হবে। এরকম আত্মবিশ্বাস আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি কখনোই আমার কোনো চরিত্রকে দ্বিতীয় গ্রন্থে টেনে আনিনি। কিন্তু আহীর সেটা বুঝতে রাজি নয়। এতদিনে তার সঙ্গে আমার একটা মমতার বাঁধন তৈরি হয়েছে। সে

রীতিমতো জোর করতে শুরু করল। পৃথিবীর অন্য কেউ হলে আমি রাজি হতাম না কিন্তু এই অল্পবয়স্ক ছটফটে উৎসাহী সৃজনশীল সুদর্শন যুবকটির জন্য আমার অজান্তেই বুকের মাঝে এক ধরনের মমতার জন্ম হয়েছে। আমি তাকে বললাম ফেব্রুয়ারির বইমেলার পর তাকে স্ক্রিপ্ট লিখে দেব– ফেব্রুয়ারি আসার অনেক আগেই সে আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

জগৎ অনিত্য, কেউই বেঁচে থাকবে না। সবকিছু জানার পরও একটি মৃত্যু এসে আমাদের সবকিছুকে ওলট-পালট করে দেয়। আহীরের মৃত্যুটিও এসে সবকিছু ওলট-পালট করে দিল। প্রথম প্রথম মনে হতো– কেন তার সঙ্গে পরিচয় হলো– পরিচয় না হলেই তো আমাকে এত কষ্ট পেতে হতো না। এখন মনে হচ্ছে, আমার খুব বড় সৌভাগ্য তাই আহীর এত কম সময় নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও তার সঙ্গে আমার ক্ষণিকের জন্য দেখা হয়েছিল। এই ছোট সময়টিতেই সে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, প্রত্যুত্তরে আমি তাকে কিছু দিতে পারিনি। তবুও আমার ভিতরে খুব ছোট একটা সান্ত্বনা, মাত্র কিছুদিন আগে আহীর আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আপনি আমার কাজ দেখে খুশি হয়েছেন ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি।'

'তাহলে আমাকে একটা ঈদের নাটক লিখে দেন।' আমি আকাশ থেকে পড়লাম, বললাম, 'আমি বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য ছেলেমানুষী লেখা লিখি– ঈদের নাটক লিখব কেমন করে!'

আহীর জোর করল– বলল, 'আপনি পারবেন। সময় আছে– আপনি চিন্তা করতে থাকেন।'

আমি কখনোই অনুরোধে এ ধরনের ঢেঁকি গিলি না, কিন্তু কী হলো জানি না, শুধু আহীরকে খুশি করার জন্য রাতজেগে একটা নাটক লিখে ফেললাম। তাকে যখন জানিয়েছি সে একেবারে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠল। আমার বাসা থেকে শুক্রবার স্ক্রিপ্ট নিয়েছে, মারা গিয়েছে মঙ্গলবার।

আহীরের মৃত্যুতে আমার কোনো সান্ত্বনা নেই– শুধু এইটুকু বলে নিজেকে প্রবোধ দেই, আমার কাছে সে ছোট একটা আবদার করছিল, আমার ক্ষমতা নেই জেনেও শুধু আহীর বলেছিল বলে আমি সেটা তার জন্য করেছিলাম। তার সৃজনশীল জীবনের অসংখ্য আনন্দের মাঝে হয়তো একটিবার হলেও আমি তাকে একবিন্দু আনন্দ দিয়েছিলাম!

আহা! যদি কোনোভাবে জানতাম সে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে তাহলে তার জীবনটিকে আরো আনন্দময় করার জন্য আমি কি আরো কিছু একটা করতে চাইতাম না ?

প্রথম আলো
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১

জয় হোক গণতন্ত্রের– জয় হোক বাংলাদেশের

প্রথম যখন বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের নির্বাচনটি হবে সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের প্রথম তখন আমি বুকের মাঝে এক ধরনের শঙ্কা অনুভব করেছিলাম– কারণ এই সময়টা আমাদের দেশের বন্যার সময়। বানভাসি মানুষের তখন কী কষ্ট– শিশুকে বুকে জড়িয়ে মা, সব সহায়-সম্বল মাথায় নিয়ে বাবা, মায়ের আঁচল কিংবা বাবার কোমর জড়িয়ে থাকা কিশোর সন্তান এক বুক পানি ঠেলে আশ্রয়ের খোঁজে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে– তখন মানুষ ভোট দেবে কেমন করে ? যতই ভোটের সময় এগিয়ে আসছিল আমি ততই মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজের দিকে চোখ রাখছিলাম– চাঁদপুরে স্টিমার ঘাট, রেল স্টেশন ধসে যাওয়ার খবরে বুকের মাঝে হঠাৎ ধক্ করে উঠেছিল কিন্তু পরে দেখলাম এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। সারা দেশে এখনো বন্যার কোনো খোঁজ নেই। আমি নিশ্চিত বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা এর কারণ খুঁজে বের করে ফেলবেন কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগে যে, এই দুঃখী দেশটার জন্য খোদার এক ধরনের মায়া আছে, তাই এই বছর নির্বাচনের সময় তিনি বন্যাটাকে আটকে রাখছেন, যেন সারা দেশের মানুষ এটাকে একটা উৎসবের মতো পালন করতে পারে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে খুব জোর গলায় একটা খবর পৌঁছে দিতে পারে যে, তারা প্রক্রিয়াটাকে যতই কলুষিত করার চেষ্টা করুক না কেন, এই দেশে গণতন্ত্র পাকাপাকিভাবে খুব শক্ত ভিতের মাঝে বসিয়ে দেওয়ার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু তাদের দায়িত্বটুকু খুব আন্তরিকভাবে পালন করে যাবে।

নির্বাচনের তারিখটি যতই এগিয়ে আসছিল খবরের কাগজ দেখে ততই মন খারাপ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। মনে হয় খবরের কাগজের লোকজন বুঝি খুঁজে খুঁজে শুধু খারাপ খবরগুলোই ছাপছে, খুনোখুনি, হাঙ্গামা, মারপিট, ঘরবাড়ি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, বোমাবাজি, কুৎসিত গালাগাল– কী নেই! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে দলবদল করার হিড়িক, এক দলের নমিনেশন না পেয়ে কয়েক যুগের আদর্শ এবং ত্যাগ ছেঁড়া জুতোর মতো ছুড়ে ফেলে অন্য দলে নাম লিখিয়ে ফেলা– নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না, রাজনীতির পুরো পদ্ধতিটার ওপরেই কেমন যেন বিতৃষ্ণা এসে যেতে চায়। নিজেকে বুঝিয়েছি, এসব ক্ষুদ্র একটি অংশ– দেশের বেশির ভাগ প্রার্থী নিশ্চয়ই সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা, নিজের দেশকে এবং নিজের দলকে, দলের আদর্শকে ভালোবাসেন। রাজনৈতিক দল আর তাদের প্রার্থীরা যাই করুক দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু উৎসবের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আমার কাছে নেদারল্যান্ড যাওয়ার একটি আমন্ত্রণ এসেছিল– হিসাব করে দেখেছি সেটা নির্বাচনের মাঝে পড়ে যায়, দেশের এত বড় একটা ব্যাপারে থাকতে পারব না সেটা তো হতে পারে না, আমি তাই না করে দিয়েছি। আমাদের বাসার কাজে সাহায্য করার মেয়েটি এবং ড্রাইভারও ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে ভোট-উৎসবে যোগ দেওয়া জন্য, ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনা-নেওয়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, বাসায় কাজের মানুষ নেই বলে নিজেরাই থালাবাসন ধুচ্ছি কিন্তু একবারও অভিযোগ করিনি। আমি ভোটার হয়েছি ঢাকায় তাই ঢাকা চলে এসেছি, ট্রেনে আমার

মতো অনেকে– সবাই ভোট দিতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে ভোট দিতে। যেদিকেই তাকাই সেদিকেই নির্বাচনী প্রচারণা, মানুষজনের মিছিল, হাত-পা নেড়ে মজার মজার স্লোগান। আগে যখন একটা মিছিল যেত রাস্তার গাড়িঘোড়া বন্ধ হয়ে ট্রাফিক জ্যাম লেগে যেত। নির্বাচনী মিছিল অন্যরকম, ভোট চাইতে এসে তো সাধারণ মানুষকে পীড়ন করা যায় না– তাই মিছিলের পাশ দিয়ে দিব্যি গাড়ি, রিকশা-যানবাহন যাওয়ার ব্যবস্থা মিছিলের মানুষগুলোর মুখে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমার বড় ভালো লাগে। দেশের সাধারণ মানুষ যদি এই পদ্ধতিটিতে অংশ না নেয় তাহলে কেমন করে হবে?

আজকের দিনটি দেশের জন্য একটা খুব বড় ঘটনা। ১৯৭১ সালে যে দেশটি নৃশংস অত্যাচারকে যুদ্ধ দিয়ে পরাজিত করে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান নামক সেই দেশটির এখন টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার অবস্থা– তালেবান নামক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এখন তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ধরে টান দিয়েছে, ভবিষ্যতে কী হবে কেউ বলতে পারে না। অথচ আমরা গণতন্ত্রের ঝাণ্ড উড়িয়ে দুটি নির্বাচিত সরকার শেষ করে তৃতীয়টির জন্য অগ্রসর হচ্ছি– কী চমৎকার একটি ব্যাপার! মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তারা যদি দেখতেন নিশ্চয়ই আজ খুব খুশি হতেন।

আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিশ্চয়ই বিষাদ এসে স্পর্শ করত, যে ঘাতক-দালালেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সোনার সন্তানদের হত্যা করেছে তাদের অনেকে এই নির্বাচনের প্রার্থী। খবরের কাগজে তাদের ছবি ছাপা হয়, টেলিভিশনে তাদের হাত উঁচিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির পাশে বসে তারা কথা বলেন– এই কলঙ্কটি আমাদের। আমরা এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারিনি– আমার বড় ভাবতে ইচ্ছে করে দেশের সাধারণ ভোটাররা খুব ঘৃণাভরে তাদের প্রত্যাখ্যান করবেন। একই ধরনের ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করবেন সন্ত্রাসীদের, ঋণখেলাপিদের, দলত্যাগীদের এবং নীতিহীন অসৎ মানুষদের। রাজনৈতিক নেতারা এক ধরনের কু-রাজনীতি নিয়ে আসতে চান কিন্তু সাধারণ ভোটাররা নিজের মতো করে ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কী চায় সেটি দেখিয়ে দিয়ে কি একটা চমক লাগিয়ে দিতে পারে না?

২.

নির্বাচনের ফলাফল কী হবে সেটি নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনার শেষ নেই। যখনই কারো সঙ্গে দেখা হয় ঘুরেফিরে নির্বাচনের কথা এসে যায়, কোন এলাকায় কার অবস্থা ভালো, কার অবস্থা খারাপ সেটা নিয়ে জ্ঞানগম্যির আলোচনা হতে থাকে। কার ভোট ব্যাংকে এখন কত ভোট আছে, ঘটনাপ্রবাহে সেই ভোট ব্যাংকে আরো কত জমা পড়েছে বা আরো কত ঘাটতি হয়েছে তার 'নিখুঁত' পরিসংখ্যান দেওয়া হতে থাকে। যে যার সমর্থক সে তার সম্পর্কে অবধারিতভাবে একটা আশাবাদ ব্যক্ত করে ফেলেন!

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা খুব কঠিন। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ থাকে গ্রামে, তাদের এক-চতুর্থাংশের বাসাতেও ইলেকট্রিসিটি নেই, যাদের আছে তাদের একটা ক্ষুদ্র অংশও রেডিও-টেলিভিশন দেখার সুযোগ পান কি না সন্দেহ। এই মাধ্যমগুলোও সরকার নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এখান থেকে দেশে কিংবা সরকার সম্পর্কে নিরপেক্ষ একটা ধারণা পাওয়া খুব

কঠিন। আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলো মোটামুটিভাবে স্বাধীন। দেশের সত্যিকার অবস্থাটি কম-বেশি কিংবা অতিরঞ্জিত হয়ে চলে আসে। পত্রপত্রিকার সার্কুলেশন থেকে অনুমান করা যায় সব মিলিয়ে ১০ থেকে ১৫ লাখ মানুষ হয়তো খবরের কাগজ পড়েন– তাদের প্রায় সবাই হচ্ছে নগরবাসী। গ্রামের পুরুষ মানুষ হয়তো হাটে-বাজারে গিয়ে কিছু খোঁজখবর নিয়ে আসেন– মহিলারা নিশ্চিতভাবেই সব তথ্যপ্রবাহ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে দেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীই কিন্তু আজ দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন।

কাজেই আমাদের মতো মানুষরা নির্বাচন সম্পর্কে কী বলি, কী ভাবি তাতে কিছু আসে-যায় না– ভোটারদের সবচেয়ে বড় অংশটি কী ভাবেন সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গত পাঁচ বছর তাদের দৈনন্দিন জীবন কেমন ছিল, দু-মুঠো খেতে পেরেছেন কি না, মাথার ওপর আশ্রয় ছিল কি না, সন্তানদের জামা-কাপড় দিতে পেরেছেন কি না, স্কুলে পাঠাতে পেরেছেন কি না, টাউট-মাতাব্বর, সন্ত্রাসী জীবন দুর্বিষহ করে ফেলেছে কি না– এসব ব্যাপারই সবকিছু ঠিক করবে, আমাদের মতো নগরবাসী বুদ্ধিজীবীদের সেটি জানা নেই।

এর মাঝে প্রচারণার হয়তো একটা ভূমিকা আছে– প্রচুর টাকাও বিলানো হচ্ছে শুনেছি। যাদের অন্য প্রার্থী বা অন্য দলের সমর্থক হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে তাদের ভয়-ভীতি দেখানো হচ্ছে এবং এর সহজ টার্গেট হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা। খবরের কাগজে ব্যাপারটি এসেছে, তার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আশা করছি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। নির্বাচনী প্রচারণাতেও মিথ্যাচার এবং সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার চলছে। একজনের মুখে শুনলাম তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে শুনতে পেলেন অন্য দল এসে তার প্রার্থীকে হিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে চলে গেছেন। অনেক চেষ্টা করেও তিনি তাদের বোঝাতে পারলেন না যে, কথাটি সত্য নয়। সত্যি হলেও সেটি সমস্যা হওয়ার কথা নয় কিন্তু কয়টি ভোটের জন্য ধর্মকে এভাবে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষজনকে সাম্প্রদায়িক করে ফেলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিটা কার হবে? নির্বাচনী প্রচারণা নিয়ে নানা ধরনের নোংরামির মাঝে হঠাৎ করে ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলোয় মতিয়া চৌধুরীর নির্বাচনী প্রচারণার খবরটি বুকের মাঝে এক ধরনের স্নিগ্ধ সুবাতাস বইয়ে দিল। এলাকার মানুষ তার জন্য খাটাখাটুনি করছে কিন্তু তার নিজের দলের মানুষ নাকি সুযোগ-সুবিধা পায়নি বলে খানিকটা ক্ষুব্ধ!

৩.

আজ তো নির্বাচন হয়ে যাবে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর কী হবে সেটি নিয়ে সারা দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের উৎকণ্ঠা। বড় দল, মাঝারি দল, ছোট দল সবাই বলছেন তারা জিতে যাবেন– কিন্তু সেটি তো সত্যি হতে পারে না, সবাই তো সরকার গঠন করবেন না, সরকার গঠন করতে পারবেন এক দল বা এক জোট। দেশের সব মানুষের প্রশ্ন, তখন কী হবে? কোনো দলই বলেননি তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন, সবাই বলেছেন নির্বাচন 'অবাধ', 'সুষ্ঠু' এবং 'নিরপেক্ষ' হলে তারা ফলাফল মেনে নেবেন। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে 'অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ' কথাগুলোর অর্থ কী? সে ব্যাপারেও তারা একটা আভাস দিয়ে

রেখেছেন, যেহেতু 'অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ' নির্বাচন হলে তারা জিতে যাবেন কাজেই নির্বাচনে জিতে গেলেই বুঝতে হবে সেটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে! সেটি অবশ্যই একটা সমাধান হতে পারে না। আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো মোটামুটি স্বাধীন, প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিচ্ছে, দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকরা থাকবেন, নির্বাচন কমিশনও বলছেন দরকার হলে তারা আটবার নির্বাচন করবেন তবুও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করবেন, দেশের সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব নেই, কাজেই নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকলে সেটি দেশের মানুষের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। তখন বড় রাজনৈতিক দলগুলোর খুব দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে, নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে হবে এবং সারা দেশে হরতাল, হাঙ্গামা, খুনোখুনি করে একটা অরাজক অবস্থা তৈরি করতে পারবেন না। কয়দিন আগে ট্রেনে আসার সময় আখাউড়া স্টেশনে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকা পড়ে রইলাম, নিজের দল থেকে নমিনেশন না পেয়ে কোনো একজন প্রার্থীর সমর্থকরা সব ট্রেনকে আটকে রেখেছেন, মানুষের কী কষ্ট! এরকম অযৌক্তিক এবং হাস্যকর একটা কারণে যে একেবারে নিরপরাধ, নিরীহ সাধারণ মানুষকে অত্যাচার করা যায় সেটি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। কাজেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত না হলে রাজনৈতিক দলগুলো ইচ্ছে করলে যে সারা দেশে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলতে পারেন সেটি নিয়ে আমাদের কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই, চিন্তা করেই আমাদের বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ এই নির্বাচনে আনন্দের অংশীদার হতে চায়, এর যন্ত্রণায় নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমার করজোড়ে আবেদন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। গণতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী প্রক্রিয়া, বিশাল সংসদে একজন মাত্র সংসদ সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে থেকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, সেখানে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল সরকার গঠন না করেও দেশের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কি অংশ নিতে পারে না? শক্তিশালী একটি বিরোধী দল থাকলে একটি সরকার কি কখনো দেশের স্বার্থবিরোধী, আদর্শ এবং নীতির বিরুদ্ধে একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে?

৪.

বাংলাদেশ হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে– আজকের নির্বাচনটি হবে সেই সম্মুখযাত্রার আরো একটি মাইল ফলক। নির্বাচনের ফলাফল দেখে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের এক ধরনের আত্মোপলব্ধি হবে– কামনা করি সেই আত্মোপলব্ধি হোক সঠিক। আমাদের সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য শক্তি হিসেবে কাজ করুক এই আত্মোপলব্ধি। রাজনীতিকে শুদ্ধ করুক– ঝরে যাক দূষিত রক্ত। রাজনৈতিক দলগুলো হিসাব-নিকাশ করুক তাদের জয়-পরাজয়ের কিন্তু আমাদের, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হিসাব হোক খুব সহজ এবং সরল। এই নির্বাচনে জয় আমাদের, জয় গণতন্ত্রের আর তাই জয় বাংলাদেশের।

প্রথম আলো, ১ অক্টোবর ২০০১

'সংখ্যালঘু' নয়– বাংলাদেশের নাগরিক

১.

আমি গত কয়েকদিন থেকে খবরের কাগজ পড়তে পারছি না– যে কাগজই হাতে নিই সেখানেই পুরো পত্রিকা জুড়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের খবর। (খবরের কাগজে অবশ্যি হিন্দু সম্প্রদায় বা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে না, সংখ্যালঘু বলে– কারণটি আমার ঠিক জানা নেই, সোজাসুজি সত্য কথাটি বলতে এক ধরনের সংকোচ হয় বলে মনে হয়।) মানুষের ওপর মানুষ যখন অত্যাচার করে তার চেয়ে কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না, সেটি আরো অমানবিক হয় যখন সেটি হয় প্রতিকারহীন এবং একপক্ষীয়। আমি প্রতিদিনই আশা করছি যে কিছু একটা হবে, ক্ষমতাসীন কারো শুভবুদ্ধির উদয় হবে, এই অমানবিক ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্য কেউ এগিয়ে আসবে, পুরো ব্যাপারটির অবসান ঘটানো হবে।

আমি দেখলাম অক্টোবরের ১৬ তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করে দিলেন। ডেইলি স্টারের সংবাদ অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর এই অমানুষিক বর্বরতার খবরগুলো ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (baseless, exaggerated and politically motivated)। দেশের শত শত নির্যাতন এক কথায় তিনি উড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে দ্বিতীয়বার খবরটি পড়েছি, অন্য খবরের কাগজও পড়ে দেখেছি, সত্যি সত্যি তিনি এই কথাটি বলেছেন। এ রকম অমানবিক মন্তব্য আমি এর আগে কখন শুনেছি চট করে মনে করতে পারছি না। মানুষের প্রতি ভালোবাসাহীন এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের কার হাত থেকে রক্ষা করবেন?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যটি কি একটি বিবেচনাহীন মন্তব্য নাকি অনেক চিন্তাভাবনা করে দেওয়া মন্তব্য সেটি আমি বুঝতে পারছি না। তার কথায় তিনি মোটামুটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন, এই দেশে যদি কোনো হিন্দু নির্যাতিত হন তাহলে সেটি দেশের সমস্যা নয় সেটি তার নিজের সমস্যা। কারণ সেই নির্যাতিত হিন্দু আসলে দেশকে 'অস্থিতিশীল' করার জন্য এই 'মিথ্যা সংবাদটি' ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এটি কোনো কষ্টের ব্যাপার নয়, এটি একটি 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য'। বাংলাদেশ সম্ভবত এখন পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে হিন্দু হয়ে নির্যাতিত হওয়াটাই এখন অপরাধ। কারণ এটি যদি কোনোভাবে কাগজে প্রকাশিত হয়ে যায়, সেটি হবে দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। কেউ যদি এখন এই দুঃখের প্রতিবাদ করেন, তার সেই প্রতিবাদটি মানবিক প্রতিবাদ হবে না– এটি হবে এখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত একটি ঘটনা। এই দুঃখ আমরা কোথায় রাখি?

আমার যদি সামর্থ্য থাকত তাহলে আমি বাংলাদেশের সব হিন্দু ধর্মাবলম্বীর হাত ধরে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ভালোবাসাহীন অমানবিক মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতাম।

২.

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তারা কী কী দোষত্রুটির কারণে পরাজিত হয়েছেন এখন সবাই সেই চুলচেরা বিশ্লেষণে লেগে গিয়েছেন। তারা তাদের শাসনামলে বাংলাদেশকে সবচেয়ে চমৎকার যে জিনিসটি উপহার দিয়ে গেছেন আমি সেই কথাটির কথা বলি, সেটি হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (এ জন্য তাদের কম মূল্য দিতে হয়নি)। এক অর্থে এই সংবাদপত্রই হচ্ছে দেশের সকল অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। কোথায় জানি পড়েছিলাম, বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো– শুধু যারা ক্ষুদ্র এবং দুর্বল তারাই সেখানে আটকা পড়ে, যারা সবল এবং শক্তিশালী তারা সেটি ছিঁড়ে বের হয়ে যায়। আমাদের দেশের জন্য এটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, পুরো ব্যবস্থাটি তৈরি করা হয়েছে দুর্বলকে আটক করে তাকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য। এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই বিচারের কোনো আশা নেই, পুলিশ পুরোপুরি সরকারের হাতে, আগে ব্যাপারটি প্রকাশ করা নিয়ে এক ধরনের শালীনতা ছিল– এখন আর নেই, তাদের জিজ্ঞেস করার আগেই তারা পরিষ্কার স্বীকার করে ফেলেন। দেশের সকল অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের একমাত্র অস্ত্র হচ্ছে এই সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রে অতিরঞ্জন হয়। রগরগে খবর ছাপিয়ে তার কাটতি বাড়ানো হয়। নিরপেক্ষতা নামে একটা নতুন শব্দ আবিষ্কার করা হয়েছে, ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝামাঝি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে দুর্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়– কিন্তু তারপরও এটি আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। একটি খবরের কাগজের একটি সংবাদকে 'ভিত্তিহীন' এবং 'অতিরঞ্জিত' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু সবকয়টি সংবাদপত্রের দিনের পর দিন সবকয়টি খবরকে, সম্পাদকীয়কে, আলোকচিত্রকে ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যদি কেউ উড়িয়ে দেন, তার কথা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না, তিনি এক মুহূর্তের মাঝে দেশের সকল সচেতন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এটি জানেন না, নাকি জেনেশুনে খুব চিন্তাভাবনা করে এটি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।

গত কয়েক সপ্তাহ আমি খবরের কাগজ পড়তে পারছি না, খবরের হেড লাইনে চোখ বুলাই কিন্তু ভেতরের অংশটা পড়ার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারি না। বুকের ভেতরে এক ধরনের রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষগুলোর শুধু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে এক ধরনের অমানুষিক বর্বরতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং আমরা শুধু চোখ মেলে সেটি দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছি না এই গভীর অপরাধবোধে আমি জর্জরিত হতে থাকি। আমার হিন্দু ছাত্র, সহকর্মীদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করি তাদের ভেতরে গভীর কোনো দুঃখ-ক্ষোভ-

যন্ত্রণা দানা বেঁধে উঠছে কি না। তাদের সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, এই দেশে ঠিক আমার মতোই তার সমান অধিকার, আমার কথায় যদি সমবেদনা বা করুণা প্রকাশ পেয়ে যায়– একজন মানুষকে এর চেয়ে বড় অপমান আর কীভাবে করা যায়?

গত কয়েক সপ্তাহ থেকে আমি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাইছি কিন্তু পারছি না। গত কয়েকদিন থেকে আমার মেলবক্স ভরা চিঠি– খবরের কাগজ থেকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি কিন্তু এই চিঠিগুলো তো না পড়ে আমি রেখে দিতে পারি না। আমাকে যারা চিঠি লিখে তাদের বেশিরভাগই কম বয়সী শিশু-কিশোর-তরুণ। এক ভয়ঙ্কর অমানবিক নির্যাতনের মুখোমুখি হয়ে তারা দিশেহারা– কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে বুঝতে না পেরে তারা আমার কাছে চিঠি লিখে। সেই চিঠিগুলো আমি একটু একটু করে পড়ি। মাঝে মাঝে খানিকটা পড়ে বন্ধ করে রেখে দিই, একটু পর আবার খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে আবার খানিকটা পড়ি। তারা আমার কাছে জানতে চায় তারা কী দোষ করেছিল যে, এই দেশে তাদের স্থান নেই? একজন লিখেছে, '...এ দেশকে প্রচণ্ড ভালোবেসে এ দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন আপনার মাধ্যমে সরকারকে জানাতে চাই যে, একটা চুক্তি করুক এই সরকার ভারতের সঙ্গে, ভারতের সব মুসলমান বাংলাদেশে এবং এ দেশের হিন্দুরা ভারতে চলে যাবে। আমাদের জীবনের নিরাপত্তা কার কাছে চাইব?...' মানুষ না জানি কত দুঃখে এই কথাগুলো লেখে।

আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বিনীতভাবে জানাতে চাই, খবরের কাগজের এই তথ্যগুলো ভিত্তিহীন-অতিরঞ্জিত নয়, খবরগুলো সত্যি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন 'সংখ্যালঘু' আসলে আওয়ামী লীগের 'ভোট ব্যাংক' এবং এই ছোট্ট একটা শব্দ ব্যবহার করে তাদের সকল পরিচয় মুছে দিয়ে তাদের নামহীন, পরিচয়হীন, সুখ-দুঃখ-কষ্টহীন, অধিকারহীন, ভালোবাসাহীন পরিসংখ্যানে পাল্টে দিল। এ দেশে এখন তারা শুধু একটি সংখ্যা।

৩.

নির্বাচনের পর আমাদের নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ বলেছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এ দেশে নতুন কিছু নয়। সমান সমান দুই দল যখন একে অন্যকে আক্রমণ করে সেটিকে বলে দাঙ্গা। বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে যা হচ্ছে সেটি দাঙ্গা নয়– সেটি হচ্ছে নির্যাতন। এখানে এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে যাচ্ছে– অসহায় মানুষ পাল্টা আক্রমণ করে প্রতিরোধ করছে না। মনে হচ্ছে এম এ সাঈদ বাংলাদেশের প্রকৃত তথ্যটি জানেন না, দাঙ্গা শব্দটি ব্যবহার করলে দুই দলকে সমান দোষী করা হয়। যে মারছে এবং যে মার খাচ্ছে দুজনই দোষী হতে পারে না। নৌকায় ভোট দিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় কারো কারো চোখে দোষ করে থাকতে পারে, কিন্তু সে জন্য তারা দাঙ্গা করছে বলা যায় না।

৪.

আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করছি সেটি একটি আধুনিক পৃথিবী। এই পৃথিবী খুব ছোট। এখানে আমরা সবাই সবাইকে চিনি। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর প্রিয়জন হারানো ব্যাকুল ভয়ার্ত মহিলাটিকে আমরা ধুলিধূসরিত নিউইয়র্কের রাস্তায় ছুটে যেতে দেখেছি। আবার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যে আফগানিস্থানে বোমা ফেলা হয়েছে সেই বোমাবিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপে হতচকিত বিভ্রান্ত আতঙ্কিত ফুটফুটে শিশুটিকেও আমরা দেখেছি। কৌশলী গণমাধ্যম আমাদের যেটাই বোঝানোর চেষ্টা করুক, মানুষের ব্যাকুল ভয়ার্ত হতচকিত আতঙ্কিত চোখের দৃষ্টি দেখে আমরা সত্যি কথাটি বুঝে যাই, আমরা সবাই মানুষ এবং আমরা আজ খুব বিপদের মাঝে আছি। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীরা সারা পৃথিবীর মানুষকে একটা মানবতার বন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করে আসছিলেন- তারা যেটি পারেননি বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী আর প্রযুক্তিবিদরা সেটি করে ফেলেছেন। মহাকাশে উপগ্রহ, মহাসাগরের নিচে সাবমেরিন ক্যাবল, তথ্যপ্রযুক্তি আর তার পেছনের মানুষগুলো সারা পৃথিবীর মানুষগুলোকে মানবতা নামে সেই অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে ফেলেছেন। তাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেরকম মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়, তখন সারা পৃথিবীতে মানুষ সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে পথে নেমে আসে।

এই নতুন পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। এটি একটি পুরাতন অচল অস্ত্র, এক সময় এই অস্ত্র ব্যবহার করে পৃথিবীতে অনেক অবিচার করা হয়েছে কিন্তু তার দিন শেষ হয়ে আসছে। কেউ যখন এই অস্ত্র ব্যবহার করে, সে খুব সাময়িক একটা সুবিধা পেতে পারে কিন্তু তার ফলে চোখের পলকে নিজের দেশকে একশ বছর পিছিয়ে দেবে। নির্বাচনের পর আমাদের দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অমানুষিক নির্যাতনের মাঝে ফেলে দিয়ে কার কী লাভ হয়েছে আমরা জানি না, কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে বাংলাদেশের যে কী ভয়ানক একটা ক্ষতি হয়েছে সেটি কেউ বুঝতে পেরেছে কি ? এর মূল্য একদিন আমাদের দিতে হবে, সেই মূল্য হবে গভীর।

আমাদের বেঁচে থাকতে হলে নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে আর নতুন পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হলে সবার আগে সাম্প্রদায়িকতাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। কেউ যদি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় কিছু বোঝার আগেই দেখবে, সেটি ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে তাকে ধ্বংস করতে ফিরে এসেছে। নিজের ধর্মের জন্য মমতা আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিস নয়- অন্যের ধর্মের জন্য যার শ্রদ্ধাবোধ নেই সে কেমন করে নিজের ধর্মকে ভালোবাসবে ? ঢাকায় বসে বড় বড় মহৎ কথা উচ্চারণ করা আর দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনে সেটির প্রতিফলন ঘটানো এক কথা নয়। দুর্গাপূজা আসছে, খবরের কাগজে দেখছি সেটি যেন 'সাড়ম্বরে' পালন করা যায় তার 'প্রস্তুতি' নেওয়া হচ্ছে- আমার পরিচিত একজনকে আসন্ন পূজার জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছি। তার কাছে জেনেছি এই পূজায় তাদের কোনো উৎসব নেই।

পৃথিবীর সৌন্দর্য হচ্ছে বৈচিত্র্যে- পৃথিবীর শক্তিও হচ্ছে বৈচিত্র্যে। বাংলাদেশের মানুষের মাঝে বৈচিত্র্য খুব কম- আমাদের সবাই এক রকম, আমি তাই বুভুক্ষের মতো সেই বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়াই। আমার বড় ইচ্ছা করে দৈনন্দিন কাজকর্মে আমি আমার চারপাশে অন্য ধর্ম, অন্য সংস্কৃতির মানুষ খুঁজে পাই। তাদের উৎসব, পূজাপার্বনে অংশ নিই, তাদের ভিন্ন জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হই। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা তাদের দূরে ঠেলে রেখেছি- একটা বিশাল শক্তিকে অবহেলা করছি। আধুনিক পৃথিবীতে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমরাও যদি আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ হতে চাই তাহলে সবার আগে আমাদের দেশের সেই অল্প কয়েকজন ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষকে সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৫.

আগেই বলেছি আমি প্রচুর চিঠি পাই, আমার কাছে যারা চিঠি লিখে তারা বেশিরভাগই শিশু-কিশোর এবং তরুণ। যারা কম বয়সী তারা কোনো কিছু নিয়ে ভান করে না, তাই তাদের চিঠিগুলো হয় আশ্চর্য রকম সহজ-সরল। এক হিসেবে আমি খুব সৌভাগ্যবান- সাধারণ মানুষেরা রেডিও-টেলিভিশন ও খবরের কাগজ থেকেও যেটা জানতে পারে না আমি অনেক সময় ব্যক্তিগত চিঠি থেকে সেটা জেনে যাই। দেশের একজন অন্যতম ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচারে নির্যাতিত হয়েছে এমন একজন মহিলার ছোট মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখে তার কষ্টটা জানিয়েছিল- সে কোনো বিচার চায়নি, কারো সঙ্গে তার দুঃখটা ভাগাভাগি করতে চেয়েছিল। পরিবারের কেউ মারা গেলে আপনজনেরা যেরকম একত্র হয়ে দুঃখটা ভাগাভাগি করে নেয়, অনেকটা সে রকম। সবার চিঠিতেই দুঃখ-কষ্ট থাকে না, বেশির ভাগই থাকে আনন্দের এবং স্বপ্নের। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমার এই সরাসরি যোগাযোগের কারণে আমি আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্ন দেখার সাহস পাই।

কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে আমি সেই চিঠিগুলো খুলতে ভয় পাচ্ছি- আগে কখনোই এরকম হয়নি। খামের উল্টো পৃষ্ঠায় কিংবা চিঠির নিচে বাংলা নাম দেখলেই আমার বুক কেঁপে উঠছে। চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যায়। কেউ কেউ নাম লিখে সেটি আবার কেটে দিয়েছে, এক ধরনের আতঙ্ক যদি কোনোভাবে তার নামটি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন তার কী হবে ? নিজের প্রতি একটা লজ্জা, একটা অপরাধবোধে আমি দিশেহারা বোধ করি।

মানুষ একটি বয়সে পৌঁছে গেলে ঘাত-প্রতিঘাত খেয়ে অবিচারকে গ্রহণ করতে শিখে যায়, বুকের ভেতরে ক্ষোভকে পুষে রেখে মুখ বুজে বেঁচে থাকতে শিখে যায়। কিন্তু ছোট একটি শিশু বা কিশোরের জন্য সেটি সত্যি নয়- এটি তাদের স্বপ্ন দেখার সময়, এখন কেন তারা অবিচারকে পৃথিবীর প্রচলিত নিয়ম হিসেবে মেনে নেবে ? তারা কেন স্বপ্ন দেখবে না ? শুধু ঘটনাক্রমে এই দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে জন্ম নিয়েছে বলে কেন তারা সব সময় বুকের ভেতরে একটি আশঙ্কা নিয়ে বেঁচে

থাকবে ? অকারণ লাঞ্ছনা-অপমানের ভয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকবে ? একটি কম বয়সী বাচ্চা যখন আমাকে এই প্রশ্ন করে, আমি অবাক হয়ে আবিষ্কার করি যে আমি সেই প্রশ্নের উত্তর জানি না। এক গভীর অপরাধবোধের কারণে আমি চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে পারি না।

কিন্তু এর উত্তরটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে– আমার মনে হয় যেরকম একটি কম বয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আমাকে এরকম একটি প্রশ্ন করেছে, ঠিক সেরকম একটি কমবয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে আবার আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমাদের দেশের এই নতুন প্রজন্মকে বড় করতে হবে আধুনিক পৃথিবীর আধুনিক মানুষ হিসেবে। তারা বুকের ভেতর একটি ছোট কৌটায় শুধু নিজের ধর্মের মানুষের জন্য ভালোবাসাকে লালন করবে না, তাদের বুকের ভেতরে থাকবে সবার জন্য ভালোবাসা, সবার জন্য সম্মানবোধ। সেরকম একটি প্রজন্মকে গড়ে তোলার ব্যাপারে যদি আমাদের কারো কিছু করার থাকে, আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এখনই, এই মুহূর্তে।

আসন্ন দুর্গাপূজার উৎসবে যারা অংশ নেবে তাদের সবার জন্য গভীর ভালোবাসা জানিয়ে আমি বলতে চাই, মানুষের ওপরে কেউ যেন বিশ্বাস না হারায়। প্রতিটি দুর্বৃত্তের পাশাপাশি এই দেশে এখনো লাখ লাখ সচেতন মানুষ আছে– তারা এই দেশের দুঃখী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেই। আগেও এসেছে, ভবিষ্যতেও আসবে।

প্রথম আলো

২২ শে অক্টোবর ২০০১

স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে কল্পনা করলেই আমার সামনে একটি দৃশ্য ফুটে ওঠে। আমি দেখতে পাই, ভোর হয়েছে আর দলে দলে তরুণ-তরুণীরা ছোট ছোট মোটর সাইকেলে বের হয়েছে। তারা সুন্দর কাপড়-জামা পরেছে। তারা আধুনিক, তারা স্মার্ট। তারা রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় সবুজ ধানক্ষেত। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় ট্রাফিক লাইট লাল হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবাই মোটর সাইকেল থামিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখন দেখা গেল, ছোট বাচ্চারা গুটি গুটি পায়ে রাস্তা পার হচ্ছে। তাদের পিঠে বইয়ের ব্যাকপ্যাক কিন্তু কেউ বইয়ের ভারে কুঁজো হয়ে নেই। তারা চোখ বড় বড় করে হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, তাদের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। ছোট মেয়েদের চুলগুলো ঝুঁটি করে লাল রিবন দিয়ে দুপাশে বাঁধা। মোটর সাইকেলে বসে থাকা কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা সস্নেহে স্কুলে যাওয়া বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা ট্রাফিক সিগন্যাল আবার সবুজ হওয়ার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। দূরে তাদের অফিস দেখা যাচ্ছে। সবুজ ধানক্ষেতের মাঝে আধুনিক একটি বিল্ডিং। ঘিঞ্জি শহরের সুউচ্চ দালান নয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা চমৎকার একটি স্থাপত্যশিল্প। ছাদের ওপর বড় একটি এন্টেনা উপগ্রহের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তরুণ-তরুণীরা ঘড়ির দিকে তাকায় একজন আরেকজনের দিকে তাকায়, তাদের চোখেমুখে একাগ্রতা, সতেজ উৎসাহের ছাপ। এ রকম সময় ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হয়ে গেল। তরুণ-তরুণীরা আবার তাদের মোটর সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতে শুরু করল। এরা সবাই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম– এরা সবাই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

আমি নিশ্চিত, সবাই আমার স্বপ্নের কথা শুনে খানিকটা কৌতুক অনুভব করবে। পরিসংখ্যান হিসাব, তথ্য-উপাত্ত দিয়ে যখন একটি গুরুগম্ভীর নিবন্ধ ফেঁদে ফেলা যায়, তখন আমি কেন একটি কাল্পনিক দৃশ্যকে আমার স্বপ্ন হিসেবে দেখতে চাই ? তার কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, আমার স্বপ্নের ক্ষেত্রটি ঢাকা শহর নয়, এটি বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। দেশের উন্নতির কথা বললেই আমরা ঢাকা শহরের কথা বলি। ভালো স্কুল, ভালো কলেজ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যা কিছু ভালো তার সবকিছু ঢাকা শহরে। আমি যখন বাংলাদেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখি তখন সেটি শুধু ঢাকা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না, আমি সেটি পুরো বাংলাদেশকে নিয়ে দেখতে চাই।

কেউ লক্ষ করেছেন কিনা জানি না, আমি কয়েকবার বলেছি দুপাশে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত। ধানক্ষেত আমার ভারি প্রিয় একটি জিনিস, সেটি একটি কারণ; এবং দুপাশে ধানক্ষেত বলে আমি বোঝাতে চেয়েছি এটি শহরের মাঝখানে নয়, এটি গ্রামাঞ্চলে। ভবিষ্যতের বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিটি শুধু যে ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকবে না তা নয়, সেটি বাংলাদেশের একেবারে নিভৃত একটি গ্রামে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। দুপাশে ধানক্ষেতের কথা বলে আমি একই সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছি খাদ্যে শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ

বাংলাদেশের নয়, খাদ্যে উদ্বৃত্ত বাংলাদেশের। একবার আমার একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেখানে একজন কৃষককে সম্মান করে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধান চাষ করে শুধু তার গ্রাম থেকেই সব কৃষক মিলে প্রায় কয়েক কোটি টাকার ধান বিক্রি করেন। বাংলাদেশের ৬০ হাজার গ্রামের সবাই যদি এ রকম ধান উৎপাদন শুরু করে দেন, তাহলে কি আমাদের শুধু গার্মেন্টস আর তথ্যপ্রযুক্তির দিকে মুখ তুলে চেয়ে থাকতে হবে ? কাজেই কেউ যেন মনে না করেন আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের ধানক্ষেত শুধু সৌন্দর্যের জন্য, তার অন্য একটি ভূমিকাও আছে।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে মোটর সাইকেলে করে ছুটে যাওয়া তরুণ-তরুণীদের সবাই যে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তার কারণ দুটি। তার অর্থ প্রথমত, দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তাঘাটেও ট্রাফিক সিগন্যাল রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সবাই সেটি মানছে। যারা ট্রাফিক আইন মানে তারা দেশের সব আইন মানে। কাজেই আমার স্বপ্নের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হবে আইনের ওপর শ্রদ্ধাশীল একটি প্রজন্ম, তারা হবে সুনাগরিক।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে যে কথাটি সবচেয়ে বেশিবার বলেছি, সেটি হচ্ছে কমবয়সী তরুণ-তরুণী। তরুণ-তরুণী মাত্রই কমবয়সী হয়, কিন্তু তবু যে ইচ্ছে করে কমবয়সী শব্দটি ব্যবহার করেছি তার একটি কারণ আছে। তথ্যপ্রযুক্তির মূল চালিকাশক্তি পৃথিবীর সব জায়গাতেই কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা, এবং আমি স্বপ্ন দেখি এ দেশের বেলায়ও সেটি সত্যি হবে। তার অর্থ আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা বের হবে তাদের সুদীর্ঘ সেশনজটে আটকে থাকতে হবে না, তারা ঠিক সময়মতো পাস করে বের হবে। আমার ভাবতে একই সঙ্গে অবাক ও দুঃখ লাগে, যে জিনিসটি পৃথিবীর সব জায়গায় একটি অতিস্বাভাবিক ব্যাপার সেটি নিয়ে আমাদের এখনো স্বপ্ন দেখতে হয়। সেই স্বপ্ন কখনো সত্যি হবে কিনা আমরা কেউ জানি না।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা খুব ভোরে তাদের কাজে বের হয়েছে। এর অর্থ তারা পরিশ্রমী, কাজ করার একটি নতুন ধরনের সংস্কৃতিতে তারা অভ্যস্ত। তাদের চোখমুখ উৎসাহ ও একাগ্রতায় ঝলমল করছে। একটি দিন শুরু করার আগে তাদের চোখেমুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন নেই, কারণ তারা আগ্রহ নিয়ে দিনটি শুরু করতে যাচ্ছে। তারা কী করবে সেটি তারা জানে, কীভাবে করবে সেটিও জানে। তারা শিক্ষিত, তারা খাঁটি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ। যার অর্থ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি আধুনিক, আমরা সত্যিকার অর্থে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে পারছি।

এ ব্যাপারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, পড়াশোনার ব্যাপারে আসলে কোনো শর্টকাট নেই। তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলতে হলেই আমরা যে ভারতবর্ষের উদাহরণ দিই সেই ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি সমানভাবে বিকশিত হয়নি। যেসব রাজ্যে সত্যিকার অর্থে দীর্ঘদিন থেকে পড়াশোনার একটি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে সেখানে এই তথ্যপ্রযুক্তিটাও গড়ে উঠেছে। যারা প্রাথমিক স্কুলে, মাধ্যমিক স্কুলে, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে, কলেজে ঠিকভাবে পড়াশোনা করেছে, যাদের সৃজনশীলতা শেখানো হয়েছে, তারা শুধু যে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিকশিত হয়েছে তা নয়, তারা অন্য সবদিক দিয়েও উৎকর্ষের চিহ্ন দেখিয়েছে। কাজেই আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের উৎসাহী-আগ্রহী তরুণ-তরুণীর একাগ্র

মুখমণ্ডলের পেছনে একটি অনেক বড় ইতিহাস রয়েছে। এর অর্থ দেশের পুরো শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে, এর অর্থ দেশে চমৎকার একটা শিক্ষানীতি রয়েছে, এর অর্থ দেশের ধনী-দরিদ্র সবাই পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে, এর অর্থ মুখস্থ না করে তারা সৃজনশীলতা শিখেছে, এর অর্থ তারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হয়েছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির জটিল জগতে তারা এত সহজে প্রবেশ করতে পেরেছে, এত সহজে সেখানে সাফল্যের চিহ্ন রাখতে পেরেছে।

সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে তরুণ ও তরুণীরা সমানভাবে এগিয়ে এসেছে। দেশের অর্ধেক মানুষই মেয়ে। কাজেই যেদিন আমরা দেখব বাংলাদেশের সব কাজে সমানসংখ্যক পুরুষ আর মহিলা সেদিন বুঝতে পারব আমরা আসলে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারছি। আমার স্বপ্নের বাংলাদেশে সব কাজেই মেয়েরা ছেলেদের সমানভাবে এগিয়ে এসেছে। শুধু যে সমানভাবে এগিয়ে এসেছে তাই নয়, তারা ভোরবেলা মোটর সাইকেল চালিয়ে কাজে রওনা দিয়েছে। আধুনিক বাংলাদেশের এ রকম একটা ছবি কল্পনা করতে আমি ভালোবাসি। এ রকম একটা দৃশ্যের আরো একটি অর্থ আছে, সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে ধর্মান্ধ মৌলবাদীর কোনো স্থান নেই, তারা দেশের মেয়েদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারবে না।

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের কমবয়সী তরুণ-তরুণীরা মোটর সাইকেলে করে কাজে যাচ্ছে, যার অর্থ তারা কাজ করে যে অর্থ আয় করছে সেটি দিয়েই খুব তাড়াতাড়ি মোটর সাইকেল কিনতে পারছে (শুধু তাই নয় এত সহজে যে মোটর সাইকেল কিনতে পারছে, তার অর্থ দেশে মোটর সাইকেলের ইণ্ডাস্ট্রি হয়েছে, বাংলাদেশ মোটর সাইকেল তৈরি করছে)। এত সহজে একজন কমবয়সী তরুণ কিংবা তরুণী যে মোটর সাইকেল কিনে ফেলতে পারছে তার অর্থ নিশ্চয়ই তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমরা সেটি আরো বুঝতে পারছি, তাদের কোম্পানির বিল্ডিংয়ের ওপর বসিয়ে রাখা বিশাল এন্টেনা দেখে। বাইরের পৃথিবীর কাজ করা হচ্ছে, সেজন্য উপগ্রহ ব্যবহার করে তথ্য আনা-নেওয়া করছে। সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক বসানো হয়েছে। কিন্তু তারা শুধু সেটির ওপর ভরসা করে নেই, বাংলাদেশের মানুষ উপগ্রহ ব্যবহার করছে। কারণ এর মধ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব উপগ্রহ মহাকাশে পাঠানো হয়ে গেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণের আগে আরো অনেক স্বপ্ন পূরণ হতে হয়। নিজেদের জনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে দরকার হবে প্রবাসী প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য। আমি স্বপ্ন দেখি পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা দেশে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। আমাদের এখানে অসংখ্য দক্ষ প্রোগ্রামার রয়েছে, তার সঙ্গে দরকার ডিজাইন আর্কিটেক্ট, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রজেক্ট ম্যানেজার, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ডাটাবেস, কমিউনিকেশন্স বা নেটওয়ার্কিং ডিজাইনার– এ ধরনের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। এ দেশে এরকম মানুষের সংখ্যা বলতে গেলে নেই। সত্যিকারের কাজের মাধ্যমে এরকম জনশক্তি তৈরি হয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ট্রেনিং সেন্টারে এদের তৈরি করা যায় না। এর একমাত্র সমাধান প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাহায্য। তারা দেশে ফিরে আসার জন্য শুধু প্রবল দেশপ্রেমের আশায় বসে থাকলে হবে না, তাদের এ দেশে কাজ করার একটি পরিবেশ তৈরি করে দিতে

হবে। তাই আমার স্বপ্নের একটি বড় অংশ হচ্ছে সেই প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে আনা, সে রকম একটি পরিবেশ তৈরি করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি উদ্যোগ নেওয়া।

তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যারা জড়িত তারা কমবয়সী, তাদের সন্তানেরাও ছোট। এ দেশে এলে তারা তাদের সন্তানদের ভালো লেখাপড়ার সুযোগটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইবেন। তাই যখনই আমি তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে স্বপ্ন দেখি, আমি তার পাশাপাশি চমৎকার স্কুলের স্বপ্ন দেখি, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের সৃজনশীল পরিবেশে গড়ে তুলবে। সে স্কুলগুলো শুধু বড় বড় শহরে নয়, সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে। ভোরবেলা ছোট বাচ্চারা হাত ধরাধরি করে সে স্কুলে যাবে। স্কুল নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো আতঙ্ক থাকবে না। সত্যি কথা বলতে কী, যেদিন স্কুল ছুটি থাকবে সেদিন ছোট শিশুদের মন খারাপ হয়ে থাকবে।

আমি ভবিষ্যতের বাংলাদেশের যে স্বপ্ন দেখি সেখানে সবাই যে এক ধরনের কাজ করবে তা নয়। এখন যে রকম অসংখ্য ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হয়ে আছে এবং যে অর্থ ব্যয় করতে রাজি হচ্ছে তাকেই সোনার হরিণ ধরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে ভর্তি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং বছর ঘোরার আগেই তাদের ঘটছে আশাভঙ্গ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার অনুভূতি নিয়ে তারা ফিরে আসছে, সেটি আর থাকবে না। সবাইকে প্রোগ্রামার হতে হবে, তা সত্যি নয়। যার যে ধরনের ক্ষমতা সে ঠিক সে ধরনের কাজ করার সুযোগ পাবে। যারা স্বল্পশিক্ষিত তারা হয়তো ডাটা এন্ট্রির কাজ করবে, যারা আরো দক্ষ তারা মাল্টিমিডিয়াতে যাবে, যারা আরো দক্ষ তারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করবে। আইটি সার্ভিস বলে একটি বিশাল ক্ষেত্র আছে, সেখানে অসংখ্য মানুষ তাদের জীবিকা অর্জন করবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কমিউনিকেশন্স। কাজেই আমার স্বপ্নের বাংলাদেশের তরুণদের একটি বড় অংশ হবে কমিউনিকেশন্স প্রযুক্তির দক্ষ মানুষ। তারা ইলেক্ট্রনিক্সের জাদুকর, তারা ফাইবার অপটিক্সের ওস্তাদ, তারা নেটওয়ার্কিংয়ের দক্ষ খেলোয়াড়। তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে রোবট তৈরি করে, মজা করার জন্য রোদ দিয়ে চলতে পারে সেরকম গাড়ি বানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিস্তৃত প্রান্তরের রেসিং প্রতিযোগিতায় যোগ দেবে। নতুন প্রজন্মের এই আধুনিক প্রযুক্তিবিদরা বাংলাদেশে ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তির একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে।

এসব তুখোড় প্রতিভাবান তরুণরা পড়াশোনা করবে চমৎকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ে, ব্যবসার খাতিরে গজিয়ে ওঠা ট্রেনিং সেন্টারে নয়। তারা নিজেদের তথ্যপ্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন্স প্রযুক্তিতে প্রস্তুত করবে সত্যিকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। দেশে একটি বিশাল জাতীয় আইটি ইনস্টিটিউট থাকবে, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সেখানে তাদের নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে সর্বশেষ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করবে। নতুন সহস্রাব্দের সম্পদ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম এই জ্ঞানার্জন করে অসম্ভব সম্পদশালী একটি দেশে পরিণত হবে।

তারুণ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এই নতুন প্রজন্মকে আমি চোখের সামনে দেখতে পাই, আমি জানি এটি শুধু স্বপ্ন নয়, এটি সম্ভব।

১১ নভেম্বর ২০০১

চাই অসাম্প্রদায়িক নতুন প্রজন্ম

১.

আহমদ ছফা আমার 'কলাম লেখক' পরিচয়টি খুব অপছন্দ করতেন। ছফা ভাই মারা যাওয়ার পর ঠিক করেছিলাম আসলেই এই মোটামুটি অর্থহীন কাজটি আমি ছেড়ে দেব, কিন্তু নির্বাচনের পর পর আমাদের দেশে যা ঘটছে সেটি দেখে আমার মনে হলো ছফা ভাইয়ের বিদেহী আত্মার বিরাগভাজন হয়ে হলেও আমি আরো কয়েক দিন লিখি। তার কিছু কারণ আছে। কেউ যখন মারা যায় তখন তার সব প্রিয়জনেরা একত্র হয়ে কষ্টটা ভাগাভাগি করে নেয়। এই প্রক্রিয়াটিতে নিজেদের ভেতরে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পাওয়া যায়। বাংলাদেশের মাটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে সেটি অনেকটা প্রিয়জনের মৃত্যুর মতো। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের যখন মৃত্যু ঘটে তার সঙ্গে সত্যিকার মৃত্যুর খুব একটা পার্থক্য নেই। আমার মতো যারা বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের মাটিতে কিছুতেই এই ঘটনাগুলো ঘটা উচিত হয়নি তাদের সঙ্গে মনের দুঃখটা ভাগাভাগি করার জন্য এই লেখা। অন্যের জন্য নয়, আমার নিজের জন্যই লেখা।

২.

আমি জানি না– আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয়েছে নির্বাচনের পর পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের যত খবর ছাপা হয়েছে সেই তুলনায় লেখালেখি হয়েছে খুব কম। হতে পারে আমি নিজে যে কাগজ পড়ি সেখানে যারা লেখেন তারা লিখছেন না– অন্য কাগজে লেখা হয়েছে, সেগুলো আমার চোখে পড়ছে না তার সম্ভাবনাও খুব বেশি নয়, কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন যে, খুব বেশি লেখালেখি হয়নি। আমাদের দেশে ডেঙ্গুজ্বর বা গাছকাটা নিয়েও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয় কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি নিয়ে সামাজিক আন্দোলন দূরে থাকুক সেরকম লেখালেখিও কেন হয়নি আমি ব্যাপারটির কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। খবরের কাগজের মানুষেরা শুধু কাগজের কাটতি বাড়নোর জন্য এসব লিখছে না। আসলেই হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে এটি আমরা সবাই কমবেশি জানি। সত্যি কথা বলতে কী, মাঝখানে একটি সময় গিয়েছে যখন কাগজের পুরো খবরটুকুই ছিল হিন্দুদের ওপর (না হয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর ওপর) নির্যাতনের খবর। তারপরেও আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা এই ব্যাপারটি নিয়ে বেশি কথা বলেননি তার কারণটা কী ? হতে পারে একেবারে প্রথমেই বিএনপি সরকার এটিকে একটি রাজনৈতিক অপপ্রচার হিসেবে গ্রহণ করছে, কাজেই যারা সাধারণত লেখালেখি করেন তারা একটু বিপদে পড়ে গেছেন। কিছু একটা লিখলেই তাকে বিএনপি-বিরোধী এবং সহজ সমীকরণে আওয়ামী লীগপন্থী বলে চিহ্নিত করে ফেলবে বলে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। যারা বিবেকবান মানুষ কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সরকারের ওপর নির্ভর করেন তারা

আরো বৃহত্তর কোনো উদ্দেশ্যের জন্য ঝুঁকি নিতে চাননি, মর্মবেদনাটুকু সহ্য করেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, যারা মনের দিক থেকে আওয়ামী লীগের কাছাকাছি মানুষ তারা মনের যাতনা সহ্য করে হলেও চুপ করে ছিলেন কারণ তারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, তারা মুখ খুললেই বিএনপি সরকার আরো সহজে রাজনৈতিক অপপ্রচার বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে।

সত্যিকারের কারণটি কী আমি জানি না, কিন্তু এ কথাটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না ভয়ঙ্কর একটি অমানবিক ব্যাপার নিয়ে সেরকম লেখালেখি হলো না। তার কারণে এই দেশের অনেক মানুষ মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। যে অন্যায়টুকু হয়েছে সেই ব্যাপারটি নয়- অন্যায়টিকে যেভাবে মেনে নেওয়া হলো সেই ব্যাপারটিই হচ্ছে বড় কষ্ট। আমি নিজেকে এ দেশের একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে কল্পনা করে দেখেছি যে, এরকম পরিবেশে আমার মনে নিশ্চয়ই একটি গভীর অভিমানবোধের জন্ম নিত।

৩.

আমি প্রায় ১৮ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। এই ১৮ বছরে বাংলাদেশের নামটি সে দেশের পত্রপত্রিকায় আমি ১৮ বারও খুঁজে পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু যখন তসলিমা নাসরিনকে মুরতাদ ঘোষণা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলো আন্দোলন শুরু করেছিল তখন সেই খবরটি প্রথমবার বাংলাদেশকে পাশ্চাত্যে পরিচিত করেছিল। আগে পাশ্চাত্যের লোকজন বাংলাদেশকে চিনত না- দেশের নাম বলার পর অবধারিতভাবে দেশটির পরিচয় বলতে হতো। তসলিমা নাসরিনের ঘটনার পর সবাই বাংলাদেশের পরিচয় জেনে গেল কিন্তু সেটি ছিল আমাদের জন্য খুব লজ্জার একটি পরিচয়। আমরা জানি, আমাদের দেশের মানুষ একেবারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না- সেটি যেদিক দিয়েই হোক। এটিকে কোনোভাবেই মৌলবাদীদের দেশ বলা যায় না, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের কাছে আমাদের সেই পরিচয়টিই ছাপ মারা হয়ে গেল। দেশের লাখ লাখ আধুনিক শিক্ষিত রুচিশীল সহনশীল মানুষের এতদিনের চেষ্টাকে ধুলায় লুটিয়ে অল্প কিছু উগ্র মৌলবাদীর প্রচেষ্টাই প্রাধান্য পেয়ে গেল। সবাই জেনে গেল, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে একজন মহিলা লেখককে নিগৃহীত করা হয় এবং মৌলবাদীদের অত্যাচারে তাকে দেশছাড়া হতে হয়, দেশের সরকার বা মানুষ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

এবারেও তাই হলো। আমরা জানি, অল্প কিছু দুর্বৃত্ত এই দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে কিন্তু সারা পৃথিবীর সামনে আমাদের সবার মুখে কিন্তু কালিমা লেপে দেওয়া হলো। সেই দুর্বৃত্তগুলোকে খুব সহজে খুব শক্ত হাতে দমন করা যেত কিন্তু সেটি করা হলো না। নির্বাচন কমিশনার বললেন, এটা তো হবেই; তত্ত্বাবধায়ক সরকার বললেন, এটা আমাদের দায়িত্ব না; নব নির্বাচিত বিএনপি সরকার বললেন, এটা হয়নি এবং সারা দেশের বিবেক বলে আমরা আমাদের যে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের দিকে তাকিয়ে থাকি, তিনিও বিশেষ কিছু করলেন না। (অবশ্য এতদিনে আমরা জেনে গেছি, তিনি কোন ভাষায় কথা বলবেন সে ব্যাপারেও তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না- 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক' এই চমৎকার বাংলা বাক্যটির বদলে শেষে

তাকে বলতে হয় 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। কাজেই তার হয়তো আসলেই কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।)

কিন্তু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক দেশ, এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ বিদেশে থাকে- এখন অন্যরা যখন তাদের দিকে ঘৃণাভরে তাকায় তখন তারা কোথায় গিয়ে মুখ লুকাবে সেটি কি কেউ ভেবে দেখেছে? বিদেশের সামনে মুখ উজ্জ্বল করার জন্য জোড়াতালি দিয়ে কিছু কাজ করা হয়েছিল দুর্গা পূজার সময়। হিন্দুরা খুব আনন্দ করে পূজা করছে প্রমাণ করার জন্য রাষ্ট্রদূত বা বিদেশী কূটনীতিক জাতীয় কিছু মানুষকে দেশের কিছু কিছু পূজামণ্ডপে নেওয়া হয়েছিল। সেসব পূজামণ্ডপকে রাতারাতি সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গেট তৈরি করে মাইক বাজানো শুরু করা হয়েছিল- প্রশাসনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হিন্দুরা যেন আনন্দ করে সেই ব্যাপারটি নিশ্চিত করার জন্য জোর করে হলেও করতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায় আগে শুধু নির্যাতনের বস্তু ছিল এখন ব্যাপারটি আরো বিকট হয়ে গেল, দেশের সুনামের স্বার্থে জোর করে হলেও তাদের আনন্দ করতে হবে। কী ভয়াবহ রসিকতা!

৪.

সেদিন ঢাকায় একটি মিছিলকে শাহবাগ থেকে প্রেসক্লাবের দিকে যেতে দেখছিলাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মহিলা পরিষদের বেশ কিছু মহিলা মুখে কাপড় বেঁধে হাতে ফেস্টুন নিয়ে যাচ্ছেন। আমার চোখে পড়ল মিছিলটির পেছনেই একটি দোতলা বিআরটিসি বাস। হঠাৎ করে দেখি বাসের ভেতর থেকে মাথা বের করে একজন কুৎসিত অশ্রাব্য ভাষায় মিছিলের মহিলাদের গালিগালাজ করছেন। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য- নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস না করে যাব কোথায়? ঢাকা শহরের মতো জায়গায় দল বেঁধে মিছিল করে যাওয়া কিছু মহিলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দোতলা বাসের ওপর থেকে একজন মানুষ কুৎসিত কিছু বাক্য উচ্চারণ করার দুঃসাহস পেয়েছে সেটি কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা নয়। মানুষটি জানে সে এমন একটি দেশে বাস করে যেখানে প্রকাশ্যে এরকম ভয়ঙ্কর একটি সাম্প্রদায়িক এবং অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য এখন কেউ তাকে কিছু বলবে না। দেশ এমন একটি দিকে মোড় নিয়েছে, যেখানে এই বাক্যটি এখন প্রকাশ্যে বলা যায়, উপস্থিত মানুষেরা এখন প্রতিবাদ করে না।

ঘটনাটি দেখে আমি শিহরিত হয়েছি, বাংলাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি সবকিছুর কেন্দ্রস্থল ঢাকা শহরে প্রকাশ্যে যদি এরকম একটি ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কী হচ্ছে কেউ কী কল্পনা করতে পারে?

আমাদের অনেকের ধারণা দু-চারজন হিন্দুকে খুন করা, তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, তাদের সহায়-সম্পত্তি, দোকানপাট লুট করে নেওয়া, তাদের মেয়েদের রেপ করাই হচ্ছে একমাত্র সাম্প্রদায়িক নির্যাতন। ভুল, ১০০ ভাগ ভুল। উপরের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন সেগুলো জানাজানি হয়। কখনো কখনো সেগুলো খবরের কাগজে চলে আসে। কখনো কখনো পুলিশ হস্তক্ষেপ করে, আইনের সাহায্য নেওয়া হয়। আমরা জানতে পেরে শিহরিত হই, বেশির ভাগ সময়েই কিছু করতে পারি না- অক্ষম ক্রোধে জর্জরিত হই। এই সাম্প্রদায়িক নির্যাতন হচ্ছে প্রকাশ এবং স্থূল নির্যাতন কিন্তু এর

পাশাপাশি আরো একটি নির্যাতন হয় চোখের আড়ালে। যেটি কখনো খবরের কাগজে আসে না। হিন্দু ধর্মের বলে যখন তাদের প্রতি তুচ্ছার্থে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, সিঁথিতে সিঁদুর কিংবা হাতে শাঁখা দেখে যখন একটি অশালীন উক্তি ছুড়ে দেওয়া হয়, বাংলা নামটি শুনেই যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে একজন মানুষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়, বংশ পরম্পরায় এ দেশে থাকার পরেও 'ভারতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত' বলে যখন তাদের প্রতিনিয়ত খোটা দেওয়া হয়, পারিবারিকভাবে শিখে যখন ছোট একটি শিশু হিন্দু ধর্মাবলম্বী অন্য একটি শিশুর সঙ্গে নিষ্ঠুর একটি ব্যবহার করে বসে সেগুলোও ঠিক একই রকম ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িকতা। একই রকম নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতার কথা কেউ প্রকাশ করতে পারে না, কেউ লিখতে পারে না। যারা এর ভুক্তভোগী তারা সেটি নিয়ে কারো কাছে অভিযোগ করতে পারে না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই অপমান এবং যন্ত্রণাটুকু বুকের ভেতর পুষে রাখে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনোদিন এই সাম্প্রদায়িকতার কথা জানবেন না, এ ব্যাপারে কোনোদিন কোনো থানায় জিডি করা হবে না। কোনো খবরের কাগজে কখনোই এই সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হবে না, কখনোই এর জন্য মৌন মিছিল হবে না, অনশন হবে না। যারা ভুক্তভোগী এর ভয়ঙ্কর বিষ শুধু তাদের ভেতরটুকু কুরে কুরে খেতে থাকবে, তাদের ম্রিয়মাণ করে তুলবে, বিষণ্ন করে তুলবে।

৫.

আমাকে একটি অনুষ্ঠানে একবার 'কলাম লেখক' হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় আমি খুব অবাক এবং বেশ বিচলিত হয়েছিলাম। ('কলাম লেখক' বললেই আমার সামনে সবজান্তা ছিদ্রান্বেষী এবং নিন্দুক ধরনের একটি মানুষের ছবি ভেসে ওঠে!) আমার মুখে ঘটনাটির কথা শুনে প্রথম আলোর সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান হেসে বলেছিলেন, 'আপনার একটি বই কয় কপি বিক্রি হয়? বড় জোর কয়েক হাজার। তার পাঠক আরো কয়েক হাজার। কিন্তু একটা পত্রিকা ছাপা হয় কয়েক লাখ, তার পাঠক আরো কয়েক লাখ। কাজেই আপনার বইয়ের পাঠক থেকে কলামের পাঠক কয়েক শত গুণ বেশি! আপনি যতই আপত্তি করেন কিছু করার নেই– সংখ্যার হিসেবে আপনি প্রথমে কলাম লেখক, তারপর বইয়ের লেখক!'

একেবারে অকাট্য যুক্তি এবং সেই যুক্তি ফেলে দেওয়ার কোনো উপায় নেই। ছফা ভাইয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এসব লেখালেখি বন্ধ করার ইচ্ছে থাকার পরও আমি আবার লিখছি, কারণ মনের কষ্টটি কয়েক লাখ মানুষের সঙ্গে ভাগাভাগি করার এই সুযোগ আমাকে আর কেউ দেবে না। হয়তো যারা আমার লেখাটি পড়ছেন তাদের কেউ কেউ হঠাৎ করে আমার সঙ্গে একমত হবেন। হয়তো তাদের মাঝে কেউ কেউ কম বয়সী, তরুণ– হয়তো এই দেশে তাদের ভেতর থেকে একেবারে অসাম্প্রদায়িক একটি নতুন প্রজন্ম বের হয়ে আসবে– পৃথিবীর সব মানুষই যে এক সেটি বোঝার জন্য তাদের দেহকোষের ক্রমোজম সংখ্যা গুনতে হবে না, একজন মানুষের দিকে তাকালেই তার চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, ধর্ম, অর্থবিত্ত সবকিছু উপেক্ষা করে ভেতরের মানুষটিকে দেখতে পাবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বর্ণবিদ্বেষী একটি সরকার ছিল যখন এই সম্পূর্ণ অমানবিক ব্যাপারটির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে এক ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। নেলসন

ম্যান্ডেলার লেখা 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' বইটিতে তার খুব হৃদয়গ্রাহী একটি বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তারা কোনো কোনো মানুষকে বর্ণনা করার জন্য কালার ব্লাইণ্ড কথাটি ব্যবহার করেছেন। আমরা সবাই জানি 'কালার ব্লাইণ্ড' শব্দটি মানুষের দেখার এক ধরনের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়, রেটিনার এক ধরনের ত্রুটির কারণে তারা কোনো রঙ দেখতে পারেন না। কিন্তু তৎকালীন দক্ষিণ আফ্রিকাতে এ শব্দটি খুব স্নেহভরে কিছু মানুষের জন্য ব্যবহার করা হতো যারা সত্যি সত্যি একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে মানুষের গায়ের রঙের বিভাজনটি দেখতে পেতেন না। তাদের কাছে সাদা এবং কালো মানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না– বলা যেতে পারে, তাদের গায়ের রঙটি যে ভিন্ন সেটি দেখার ক্ষমতাই তাদের ছিল না। গায়ের রঙের পার্থক্যের ব্যাপারে তারা ছিলেন অন্ধ– কালার ব্লাইণ্ড। আমার বড় ভাবতে ইচ্ছে করে আমাদের দেশেরও নতুন প্রজন্ম হবে এরকম– যেহেতু এখানে আমাদের গায়ের রঙের পার্থক্য নেই, সেজন্য তার প্রয়োজন নেই। কিন্তু অন্য সবদিক দিয়ে তারা হবে অন্ধ! এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে বুঝি দেশে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ধর্মের ব্যাপারে অন্ধ। ধর্মান্ধ বলতে আমরা যা বোঝাই তা নয়, মানুষ যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সেই 'পার্থক্যটুকুতে' অন্ধ। অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি কোনোরকম মায়া, সমবেদনা বা করুণা নয়– একেবারে হৃদয়ের ভেতর থেকে এক ধরনের উপলব্ধি যে, এই পৃথিবীতে সব মানুষের সমান অধিকার– ঘটনাক্রমে এই দেশে এক ধর্মের মানুষ কম অন্য ধর্মের মানুষ বেশি। কিন্তু সেজন্য কারো অধিকার একবিন্দু বেশি বা কম নয়। নতুন প্রজন্ম বড় হোক সব ধর্মের মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা নিয়ে। ধর্মের, সংস্কৃতির বা আচার-আচরণের বৈচিত্র্যটুকুর প্রতি গভীর কৌতূহল নিয়ে, গভীর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে।

এখনো কেউ কেউ বলছেন, আমাদের দেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবরগুলো অতিরঞ্জিত– আমি তাদের হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। (১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর একজন বেদনাহত মুসলমানের লেখায় আমি এটি প্রথমবার দেখেছি, যদিও ঠিক এই কথাটি একটু ভিন্নরূপে নাৎসিদের কবল থেকে অসহায় ইহুদিদের উদ্ধারকারী শিন্ডলারকে নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।) কথাটি এরকম : একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করার মতো। এই অত্যন্ত মানবিক কথাটির সুর ধরে বলা যায়, 'একজন' নিরপরাধ মানুষকে নির্যাতন করা, সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সম্ভ্রমহানি করা সমস্ত মানব জাতিকে নির্যাতন করা তাদের সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা বা সম্ভ্রমহানি করার মতো। একটি অত্যন্ত অমানবিক ব্যাপার ঘটার জন্য অসংখ্য ঘটনার প্রয়োজন হয় না। একটিও যদি ঘটে থাকে সেই ঘটনার জন্যও সবাইকে দায়দায়িত্ব নিতে হয়।

যারা এখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের ব্যাপারটির গুরুত্বটি ধরতে পারছেন না, তাদের কাছে আমার একটি প্রশ্ন– তারা কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই দেশে এরকম একটি ঘটনাও ঘটেনি? যদি ঘটে থাকে, তাহলে আমার প্রশ্ন, সেটি কেন ঘটবে? কেন ঘটতে দেওয়া হবে?

২১ শে নভেম্বর ২০০১

অন্যরকম বিজয় দিবস

আমি এই মুহূর্তে আমার বাসায় মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে লিখছি, আমার চারপাশে বইয়ের স্তূপ। লিখতে লিখতে হঠাৎ ইচ্ছে হলেই আমি হাত বাড়িয়ে বইয়ের স্তূপ থেকে যেকোনো একটি বই টেনে নিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পড়তে পারি। ইচ্ছে হলে বইয়ের শেলফে হেলান দিয়ে পুরোটাই পড়তে পারি। আমার সামনে ছোট ছোট বাচ্চাদের লেখা অনেকগুলো চিঠি– ইচ্ছে করলে আমি সেই চিঠির কয়েকটার উত্তর লিখতে পারি। এখানে বসে বসে অনেকক্ষণ থেকে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শুনছি, ইচ্ছে করলে সেটি পাল্টে দিয়ে অন্য কিছু শুনতে পারি। আমার হঠাৎ করে চা খাওয়ার ইচ্ছে করলে রান্নাঘরে চুলোর ওপর কেটলিটা বসিয়ে দিয়ে ঘরে পায়চারী করতে পারি। কিছু একটা খাওয়ার ইচ্ছে করলে ফ্রিজ খুলে তার ভেতরে উঁকি দিয়ে খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না খুঁজে দেখতে পারি। ইচ্ছে করলে টেলিফোনটা টেনে নিজের কাছে এনে কোনো আপনজন বা পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে পারি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যদি দেখি বইরে উথাল-পাথাল জ্যোৎস্না, শার্ট চাপিয়ে দিয়ে রাস্তায় নিজের ইচ্ছেমতো হাঁটতে পারি, ডিপার্টমেন্টে গিয়ে ল্যাবরেটরি ঘর খুলে কিছু অসমাপ্ত সার্কিট নিয়ে ভাবতে পারি।

আমার এই কাজগুলোর কোনোটিই এমন কিছু বড় কাজ নয় এবং আমি প্রতিদিনই এগুলো করছি। তবে এর মধ্যে এখন একটি পার্থক্যের জন্ম হয়ে গেছে। ২২ নভেম্বর শাহরিয়ার কবিরকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় আটকে ফেলা হয়েছে এবং প্রত্যেকবার আমি যখন আমার দৈনন্দিন ছোট একটি কাজ করছি– আমার শাহরিয়ার কবিরের কথা মনে পড়ছে এবং নতুন করে উপলব্ধি করছি তিনি এই ছোট কাজটি করতে পারছেন না। খবরের কাগজে দেখছি তার মতো একজন সম্মানী মানুষকে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাধারণ অপরাধীর মতো কোর্টে নেওয়া হচ্ছে, পুলিশ রিমাণ্ড নামক একটা ভয়াবহ ব্যাপারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আপনজন তার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, তাকে তার ডিভিশন না দিয়ে সাধারণ অপরাধীর সঙ্গে রাখা হচ্ছে এবং এসব দেখে একটি গভীর বেদনা এবং ক্ষোভ অনুভব করছি। দেশের আইনকানুন কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, তাই তিনি কবে ছাড়া পাবেন সে সম্পর্কে আমার কোনো অনুমান নেই। শুধু জানি, তিনি এখনো ছাড়া পাননি এবং এবারের বিজয় দিবসেও এই মুক্তিযোদ্ধা মানুষটি সম্ভবত নিজের বিশ্বাস এবং দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবাসার কারণে জেলখানার ভেতরে আটকা পড়ে থাকবেন।

শাহরিয়ার কবিরের অনেকগুলো পরিচয় আছে। তিনি লেখক– আমাদের দেশে 'বাচ্চাদের লেখক' ছাপ পড়ে যাওয়ার ভয়ে বড় লেখকরা বাচ্চাদের জন্য লিখেন না, কিন্তু শাহরিয়ার কবির দীর্ঘদিন থেকে বাচ্চাদের জন্য লিখে আসছেন। এই দেশের

কিশোর-কিশোরীদের হৃদয়ে শাহরিয়ার কবিরের একটি পাকাপাকি স্থান রয়ে গেছে। তার সাহিত্য কর্মের জন্যে তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি একজন সাংবাদিক এবং কলাম লেখক। চলচ্চিত্র মাধ্যমে তার খুব উৎসাহ। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার সবচেয়ে বড় পরিচয় যে, তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই মুহূর্তে যে আমি কিংবা আমার মতো ১৩ কোটি মানুষ একটি স্বাধীন দেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তার কারণ ৩০ বছর আগে শাহরিয়ার কবির এবং তার মতো অনেক মুক্তিযোদ্ধা এই দেশের স্বাধীনতার জন্যে তাদের জীবন সঁপে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ যতদিন টিকে থাকবে এই দেশের মানুষরা ততদিন শাহরিয়ার কবির এবং অন্য সব মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। কিন্তু যে মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরে বিজয় ছিনিয়ে এনে আমাদের বিজয় দিবস উদযাপন করার সুযোগ করে দিয়েছিল, বিজয় দিবসের দিনে সেই মানুষগুলোকে যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতা নামে একটি উদ্ভট কষ্টকল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত করে জেলখানায় আটকে রাখা হয় তাহলে সেটি নিশ্চয়ই হবে একটি অন্যরকম বিজয় দিবস।

২.

১৯৯৪ সালে আমি নিঃসঙ্গ গ্রহচারী নামে আমার একটি বই শাহরিয়ার কবিরকে উৎসর্গ করেছিলাম। আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকি। সেখান থেকে বাংলাদেশে শাহরিয়ার কবিরের অসাধারণ কিছু কাজকর্মের খবর পেয়ে বিশেষ করে একাত্তরের যীশু নামে এটি অসাধারণ চলচ্চিত্রের কাহিনীকার হিসেবে পরিচয় পেয়ে এই মানুষটির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধাবোধের জন্ম হয়েছিল। আমার বেশিরভাগ বই কোনো উৎসর্গপত্র ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছে, হঠাৎ হঠাৎ কোনো একজন মানুষ আমাকে এত মুগ্ধ করে যে, তাকে তখন আমার কোনো একটি বই উৎসর্গ করে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করি।

শাহরিয়ার কবির বাচ্চাদের জন্য লিখেন, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, বেঈমান এবং খুনি যুদ্ধাপরাধীদের এই দেশের মাটিতে বিচার করে দেশের কলঙ্ক মেটানোর জন্য তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তিনি মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ইতিহাসের একজন নিরলস গবেষক, অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি জীবনপাত করছেন। মাত্র কিছুদিন আগেও সার্ক দেশগুলো নিয়ে মৌলবাদবিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করেছেন (ভোট পেতে সমস্যা হবে ভেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করতে রাজি হননি বলে জনশ্রুতি আছে।), নির্বাচনের পর যখন এই দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর একটা পৈশাচিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেল এবং সবাই কী করবে বা কী বলবে সেটি নিয়ে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল তখন একটি নির্যাতিত বালিকাকে এনে সংবাদ সম্মেলন করে সবার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। আমি নিজে আমার নিজের জীবনকে নিয়ে যে কাজগুলো করতে চাই কিন্তু সবসময় করতে পারি না– নিজের অক্ষমতা এবং দুর্বলতার জন্য, শাহরিয়ার কবির সেই কাজগুলো করেন, করতে

দ্বিধা করেন না। একটি স্বাধীন দেশে একজন সচেতন মানুষ এবং সাংবাদিকের যে বিশ্বাস থাকা উচিত তার সেই বিশ্বাসটুকু আছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সেই বিশ্বাসটুকুর জন্যই রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা নামক একটি উদ্ভট মামলায় আটকে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে জাতীয় সংসদে দেশের আরো বরেণ্য মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় বিচার করার জন্য বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কী হবে জানি না। তবে এই অন্যরকম বিজয় দিবসটিতে আমার একটি নতুন উপলব্ধি হচ্ছে, যে বিশ্বাসের জন্য শাহরিয়ার কবিরকে জেলে যেতে হয়েছে আমি এবং আমার মতো আরো অসংখ্য মানুষ তো সেই একই বিশ্বাস তাদের বুকের মধ্যে পোষণ করে- তাহলে আমরাও কি দেশদ্রোহী ?

৩.

একজন মানুষকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে কীভাবে কোথায় নেওয়া হয় সে সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা নেই। আইনের পুরো ব্যাপারটিকেই আমার কাছে বেশ জটিল মনে হয়- তবে খবরের কাগজে থানার ওসি, কোর্ট ইন্সপেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারকদের নাম উচ্চারিত হতে দেখেছি। লেখক, সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধা শাহরিয়ার কবিরকে জেলে আটকে রাখার জন্য যে মানুষগুলোকে নানা ধরনের ভূমিকা রাখতে হয়েছে তাদের কাউকেই আমি চিনি না; সম্ভবত তারা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং সম্ভবত তারা মধ্যবয়স্ক এবং সম্ভবত তাদের কমবয়সী ছেলেমেয়ে আছে। যদি তাদের কমবয়সী ছেলেমেয়ে থেকে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, সেই ছেলেমেয়েরা শাহরিয়ার কবিরের ভক্ত পাঠক। এই বাচ্চাগুলো যখন শুনেছে তাদের বাবারা শাহরিয়ার কবিরের মতো একজন মানুষকে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় জেলখানায় আটকে রেখে এসেছে, তখন তাদের ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে আমার খুব জানার ইচ্ছে করে। এই ছোট ছোট বাচ্চাদের বেদনাহত মুখের সামনে কৌতূহলী চোখের সামনে তাদের সোজাসাপটা প্রশ্নের উত্তরে এসব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কী বলেছেন সেটি জানার আমার খুব কৌতূহল।

খবরের কাগজ খুললে মনে হয়, দেশের আইনশৃঙ্খলার ব্যাপারটি মোটামুটি চুকেবুকে গেছে। যারা নেহায়েৎ নির্বোধ- সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যারা এখনো দল পরিবর্তন করেনি তারা মাঝে-মধ্যে ধরা পড়ছে। কজিকাটা বকর, মাথান্যাড়া মতি এই ধরনের বিচিত্র নাম এবং ততোধিক বিচিত্র জীবন পদ্ধতির কারণে আমরা কখনোই তাদের জীবনের মধ্যে নিজেদের খুঁজে পাই না। এছাড়াও পুলিশ নিজের গরজে কিছু মানুষ ধরপাকড় করে, দেশের আইনশৃঙ্খলার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই- সেখানে উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যবসায়িক- একজন শাসালো মানুষকে ধরে তার কাছ থেকে কিছু পয়সা উপার্জন করা। কয়দিন আগে আমার কাছে একজন ছাত্র এসেছে একটি নির্দিষ্ট দিনে- সে যে আমার ক্লাসে উপস্থিত ছিল সেই কথাটি লিখে দিতে। কারণ নির্বাচনের পর একটি গণমামলায় তাকে আসামি করে দেওয়া হয়েছে। রাজনীতির কারণে এই ধরনের মামলা-মোকদ্দমায় অনেক সময়ই পুলিশ নিরুপায় এবং অসহায়। পুলিশ যেহেতু কিছু করতে পারছে না কিংবা

কিছু করতে চাচ্ছে না, তাই চাঁদাবাজ-মাস্তানদের ঠেকানোর ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের নিজের দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, তারা দলবেঁধে বাঁশি-লাঠি নিয়ে তাদের ধাওয়া করছে, সাধারণ মানুষজন সম্পূর্ণ অমানুষ হয়ে দু-চারজনকে অবলীলায় খুন করে ফেলছে।

এ রকম সময়ে আমরা হঠাৎ করে জানতে পারলাম শাহরিয়ার কবিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শাহরিয়ার কবির 'কজিকাটা বকর' নন- তাই তার সঙ্গে আমরা একাত্মতা বোধ করতে পারি এবং পুরো ব্যাপারটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ অনুভব করি। তাকে গ্রেপ্তার করার পুরো ব্যাপারটি দেশের আইনের প্রতি সম্মান রেখে করা হয়েছে কিনা সেটি নিশ্চয়ই খুঁটিনাটি বিবেচনা করে দেখা হবে কিন্তু অত্যন্ত সহজ কিছু জিনিস আমাদের মতো আইনে অনভিজ্ঞ মানুষদের পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে দেয়। শাহরিয়ার কবিরের বিরুদ্ধে অভিযোগটি কী সেটি এখনো কারো কাছে পরিষ্কার নয়। দেশের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন- এ রকম একটি ভাসা-ভাসা কথা শুনতে পাই। আমরা দেখে এসেছি এই দেশের বর্তমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীরাও বিদেশীদের কাছে নিজের দেশ নিয়ে নালিশ করেছেন, হাইকমিশনার এবং অর্থমন্ত্রী বিদেশের মাটিতে হিন্দুদের নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন, পত্রপত্রিকার কথা ছেড়েই দিলাম। এজন্য কাউকেই যদি রাষ্ট্রদ্রোহী না হতে হয় তাহলে শাহরিয়ার কবির কেন রাষ্ট্রদ্রোহী হবেন ?

আমার মনে হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংজ্ঞাটি খুব পরিষ্কারভাবে বলা দরকার এবং শাহরিয়ার কবিরকে যদি অভিযুক্তই করতে হয় তাহলে এর সংজ্ঞাটি পরিবর্তন করা দরকার। এর আগেও যাদের এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারাও অত্যন্ত সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন।

৪.

যেদিন থেকে শাহরিয়ার কবিরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেদিন থেকে আমি বোঝার চেষ্টা করছি এর কারণটা কী। আমরা যেটুকু দেখছি এবং শুনছি তাতে যেটুকু বুঝেছি যে, শাহরিয়ার কবির একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব থেকে বেশি কিছু করেননি। তার কাছে নাকি রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্যের কাগজপত্র পাওয়া গেছে- সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু একজন সাংবাদিকের কাছে সব তথ্য থাকতে পারে, তাদের কাজই হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। সংসদে যখন দেশের আরো বরেণ্য মানুষকেও রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করে বিচার করার দাবি উঠেছে, তখন হঠাৎ করে আমরা যেন এই দেশের মাটিতে একটা অশুভ ব্যাপারের চিহ্ন খুঁজে পেতে শুরু করেছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানের শাসকরা মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলত- আজ ৩০ বছর পর আবার হঠাৎ করে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের আবার রাষ্ট্রদ্রোহী বলা হচ্ছে ? মুক্তিযুদ্ধকে অতীতের একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করার একটা প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। যারা সেই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের আক্ষরিক অর্থে জবাই করেছেন, তারা এই সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ের মানুষ। সাকা চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীকে কী উপদেশ দেন আমার জানার খুব কৌতূহল- মুক্তিযুদ্ধের সময় সরাসরি তার হাতে নির্যাতিত হয়েছেন এ রকম

মুক্তিযোদ্ধাদের আমি চিনি। মনে হচ্ছে সব জায়গায় একটা চেষ্টা চলছে মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশকে ভালোবাসার এই পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যে একপোঁচ কালি মাখিয়ে দেওয়ার। শাহরিয়ার কবিরের ওপর ক্ষোভটা একটু বেশি তার কারণটি কী? তিনি একাত্তরের ঘাতক ও দালাল নির্মূল কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য, সেজন্য নাকি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর বর্বর অত্যাচারের পর অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সারা দেশের মানুষের সামনে একটি সত্যি প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য?

সেই অনেক আগে পাকিস্তানের শাসন আমলে এ ধরনের ব্যাপার ঘটত। কারো কথা যদি শাসক গোষ্ঠীর পছন্দ না হতো এবং অর্থ দিয়ে তাকে কিনে নেওয়া না যেত তাহলে ভয় দেখিয়ে তাদের থামিয়ে দেওয়া। এটাও কি সেই ধরনের একটি সঙ্কেত যে সবাই একটু সতর্ক হও– সরকারের পছন্দের বাইরে কিছু করা হলেই দেশের আইন-কানুনের যে ফাঁক-ফোকর আছে সেগুলো ব্যবহার করে যেকোনো মানুষকে যেকোনো সময় ধরে জেলখানায় ঢুকিয়ে যতদিন খুশি রেখে দেওয়া যাবে। মানুষটি দেশের যত সম্মানিত ব্যক্তিই হোক, হাতে হাতকড়া দিয়ে কিছু ক্রিমিনালের সঙ্গে যতদিন খুশি আটকে রাখা যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটির মধ্যে একটি প্রতিহিংসার চিহ্ন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আমরা যে ধাক্কা অনুভব করছি সেটি থেকে আমরা সারা দেশের কথা অনুমান করতে পারি। আমি খুব আশা করছি যে, প্রাথমিক বাড়াবাড়িটুকু সামলে নিয়ে সরকার সব ব্যাপারে শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে।

৫.

এবারে বিজয় দিবস এবং ঈদ ঘটনাক্রমে একই দিনে হতে পারে। শাহরিয়ার কবিরের একজন মেয়ে রয়েছে, যদি শাহরিয়ার কবিরকে এর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া না হয় তাহলে তার মেয়ের এই ঈদ এবং বিজয় দিবস একা একা করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব অসামাজিক মানুষ– ঈদের দিনে হৈচৈ করে কারো বাসায় গিয়েছি মনে পড়ে না– কিন্তু এই ঈদে এবং বিজয় দিবসে নিশ্চয়ই শাহরিয়ার কবিরের বাসায় যাব। তার মেয়েকে বলে আসব দেশপ্রেমের জন্য, সত্যি কথা বলার জন্য যদি কাউকে দেশদ্রোহী হতে হয় তাহলে শাহরিয়ার কবির একা নন, এই দেশে আরো অসংখ্য 'দেশদ্রোহী' রয়েছে। শুধু শাহরিয়ার কবিরকে একা বিচার করলে হবে না– এই দেশের আরো অসংখ্য 'দেশদ্রোহী'র বিচার করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৪ ডিসেম্বর ২০০১

২০৩০ সালের একদিন

টুটুল অঙ্কগুলো শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সূর্য এর মাঝে হেলে পড়তে শুরু করেছে। সে তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে রুনুকে বলল, 'রুনু চল।'

'আমার যে এখনো হোমওয়ার্ক শেষ হয় নাই।'

'এত দেরি করলি কেন? এখন কিছু করার নাই। ওঠ, ফিরে আসতে আসতে পরে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

অন্ধকার কথাটি শুনেই রুনুর মুখে ভয়ের ছাপ পড়ল, সে তাড়াতাড়ি তার বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চল।'

দুজন জুতো পরে রান্নাঘর থেকে নানা আকারের প্লাস্টিকের বোতল তাদের ছোট ঠেলাগাড়িতে তুলে নেয়, তারপর দরজা খুলে বের হয়ে চিৎকার করে বলল, 'আম্মু দরজা বন্ধ করে দাও।'

আম্মা এসে দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'সাবধানে যাবি কিন্তু।'

ঠেলাগাড়িতে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে দুজনে ছুটতে থাকে, তাদের বাসা থেকে আধা কিলোমিটার দূরে– একটি টিউবওয়েল থেকে সবাই পানি নেয়। একটু দেরি হলেই অনেক ভিড় হয়ে যাবে। রাস্তার মোড়ে সাইবার ক্যাফের সামনে এসে দুজন দাঁড়িয়ে গেল। জানালার পাশে ক্যাফের বুড়ো মতোন মানুষটি ঝিমোচ্ছে। টুটুল গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কোনো ই-মেইল এসেছে চাচা?'

বুড়ো মানুষটা চোখ খুলে বলল, 'কে? টুটুল?'

'জ্বী চাচা। আব্বুর কোনো ই-মেইল এসেছে?'

'মনে হয় এসেছে। আমি প্রিন্ট আউট নিয়ে রেখেছি। দাঁড়াও একটু দেখি।' বুড়ো মানুষটা ডেস্ক ঘেঁটে একটা ছোট কাগজের টুকরো বের করে বলল, 'এই যে। নাও।'

টুটুলের চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ পড়ল, সে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল। বুড়ো মানুষটা নরম গলায় বলল, 'তোমার মাকে বলো বিলটা দিয়ে দিতে। দুমাসের বিল বাকি পড়েছে।'

'বলব চাচা।'

রুনু বলল, 'আব্বু কী লিখেছে ভাইয়া?'

'জানি না, বাসায় গিয়ে পড়ব। আয় আগে পানি নিয়ে আসি।'

টিউবওয়েলের সামনে এর মাঝেই অনেক বড় লাইন, টুটুল আর রুনু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে পানি ভরার সুযোগ পেল। টিউবওয়েলটি একা চাপতে কষ্ট হয়। টুটুলের সঙ্গে রুনুও হাত লাগাল। রুনু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মোটর লাগানো থাকলে সুইচ টিপলেই নিজে থেকে পানি উঠত, তাই না ভাইয়া?'

'হ্যাঁ।'

'মোটর লাগায় না কেন ?'

'কেমন করে লাগাবে ? ইলেকট্রিসিটি নাই যে!'

'ইলেকট্রিসিটি নাই কেন ?'

'কেমন করে থাকবে ? জেনারেটর চালাতে গ্যাস লাগে না ?'

'ও!' রুনু চুপ করে গেল। সবাই জানে বাংলাদেশে কোনো গ্যাস নেই, যেটুকু গ্যাস ছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে পাশের দেশে রপ্তানি করে শেষ করে দিয়েছে।

পানির বোতলগুলো তাদের ছোট ঠেলাগাড়িতে করে ঠেলে আনতে আনতে টুটুল তাকিয়ে দেখল আশপাশের সব বাসা থেকে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হয়ে যাচ্ছে। কাঠ, খড়, কাগজ, প্লাস্টিক জ্বালিয়ে সবাই রান্না করছে, তার কালো ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে, তার আগেই সবাই রান্না শেষ করে নিতে চাইছে।

ঠেলাগাড়িটা টেনে টেনে রান্নাঘরে তুলে এনে টুটুল আর রুনু হাঁপাতে থাকে। মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলেন, তার মুখে কালি-ঝুলি মাখা, ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে আছে। টুটুল বলল, 'আব্বুর ই-মেইল এসেছে।'

'কী লিখেছে ?'

'এখনো পড়িনি।' পানির বোতলগুলো থেকে ড্রামে পানি ঢালতে ঢালতে বলল, 'পড়ব আম্মু ?'

'রান্নাঘরে চলে আয়।'

টুটুল আর রুনু আম্মার পেছনে পেছনে রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কংক্রিটের চুলোতে খড়কুটো, প্লাস্টিক আবর্জনা জ্বলছে, গলগল করে কুচকুচে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে, রান্নাঘরের ভেতরে একটি তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। আম্মা চুলোর ভেতরে আরো কিছু আবর্জনা ঠেলে দিলেন। ধোঁয়ার দমকে তার কাশি উঠে গেল, খক খক করে কাশতে কাশতে হঠাৎ তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। তাদের বাসায় তখন গ্যাসের চুলো জ্বলত। কী সুন্দর নীল আগুন, এতোটুকু ধোঁয়া নেই। নব ঘুরালেই জ্বলত আবার নব ঘুরালেই নিবে যেত। আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন- মাত্র ২০-২৫ বছর আগের কথা, অথচ সেই দিনগুলোকে এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়।

টুটুল পকেট থেকে কাগজটা বের করে বলল, 'পড়ব আম্মু ?'

'হ্যাঁ পড়।'

টুটুল পড়তে শুরু করে;

সোনামনি টুটুল এবং রুনু,

আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না যে, তোমাদের ৬ মাস হলো দেখিনি। শরৎকালীন ছুটির জন্য বসে আছি, তখন তোমাদের দেখতে আসব। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তোমাদের না দেখে আমার একটি মুহূর্তও কাটে না। কিন্তু তবুও এই দেশে পশুর মতো খাটছি কারণ বাংলাদেশে এখন কোনো কাজ নেই, কোনো চাকরি নেই।

যখন মনে হয় যে, বাংলাদেশও এরকম একটি দেশ হতে পারত তখন আমার খুব দুঃখ হয়। কিন্তু ২০ বছর আগে দেশের সব গ্যাস রপ্তানি করে দিয়ে দেশটাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে।

এখানে আমি যখন একটা ইলেকট্রিক লাইট জ্বালাই তখন আমার মনে হয় আমাদের দেশেও ইলেকট্রিসিটি থাকতে পারত। যখন রান্নাঘরে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রান্না করি তখন মনে হয় বাংলাদেশের মানুষও তাদের গ্যাস ব্যবহার করতে পারত। আমি রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে যাই, যখন মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে আমাদের দেশের গ্যাস এই দেশে রপ্তানি করে দিয়েছে, এই দেশের মানুষ সেই গ্যাস জ্বালিয়ে শেষ করেছে এখন আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমার শুধু ঈশপের সেই সোনার ডিম পাড়া হাঁসের গল্পটির কথা মনে পড়ে।

সোনামনিরা, তোমরা তোমাদের আম্মুকে দেখে রেখো।

তোমাদের আব্বু।

টুটুল চিঠি পড়া শেষ, করতেই রুনু জিজ্ঞেস করল, 'ঈশপের গল্পটা কী আম্মু ?'

টুটুল বলল, 'তুই জানিস না ?'

'না।'

টুটুল চোখ বড় বড় করে বলল, 'গল্পটা হচ্ছে এরকম- একজনের একটা রাজহাঁস ছিল সেটা প্রত্যেক দিন একটা করে সোনার ডিম পাড়ত। সেই মানুষটা ভাবল, প্রত্যেক দিন একটা সোনার ডিম দিয়ে কী লাভ ? তার থেকে হাঁসের পেট কেটে একবারে সবগুলো সোনার ডিম বের করে নিই! লোভে পড়ে সে হাঁসের পেট কেটে দেখে সেখানে কোনো ডিম নেই! তার তখন একেবারে মাথায় হাত।'

রুনু অবাক হয়ে বলল, 'একেবারে বাংলাদেশের মতো ? একটু একটু করে অনেক দিন গ্যাস ব্যবহার না করে একবারে সব গ্যাস বিক্রি করে দেওয়া !'

'হ্যাঁ।' আম্মা ম্লান মুখে হাসার চেষ্টা করে বললেন, 'শুধু একটা পার্থক্য।'

'কী পার্থক্য ?'

'হাঁসটা যে কেটেছিল সেই ছিল হাঁসটার মালিক। বাংলাদেশের গ্যাসের মালিক ছিল দেশের মানুষ, তারা কিন্তু কখনোই গ্যাস রপ্তানি করতে চায়নি। বিদেশী গ্যাসের কোম্পানি আর দেশের কিছু মন্ত্রী মিলে গ্যাস রপ্তানি করেছে।' আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'প্রায় ৩০ বছর আগের কথা, আমি তখন খুব ছোট। শুনেছি যে নির্বাচনের আগে তারা গ্যাস রপ্তানি নিয়ে একটা কথাও বলেনি কিন্তু নির্বাচনে জেতার পরের দিন থেকেই তারা গ্যাস বিক্রি করার কাজে লেগে গিয়েছিল।'

'কেন আম্মু ?'

'প্রায় ৩০ বছর আগের কথা- আমি ভালো করে জানি না। যতটুকু শুনেছি দেশের মানুষ, এক্সপার্ট, ছাত্র-শিক্ষক সবাই বলেছিল দেশের জন্য ৫০ বছরের গ্যাস মজুত রেখে তার থেকে যেটুকু বেশি সেটা রপ্তানি করতে। সব মিলিয়ে খুব

বেশি হলে ১০-১২ বছরের মতো গ্যাস মজুত ছিল। নতুন গ্যাস খুঁজে পাওয়ার আগেই বিদেশী কোম্পানিগুলো কী বোঝাল কে জানে গ্যাস রপ্তানি শুরু করে দিল।'

'আর গ্যাস পাওয়া যায়নি?'

'অল্প কিছু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের নিজের গ্যাস কোম্পানীকেও সুযোগ দেয়নি- তারাও কিছু করতে পারেনি।'

'গ্যাস বিক্রি করে টাকা আসেনি?'

'নিশ্চয়ই এসেছে। সেই টাকা সবাই লুটেপুটে খেয়েছে। সেজন্যই তো গ্যাস বিক্রি করতে এত উৎসাহ ছিল। এর আগেও দেশের গরিব মানুষের জন্য রিলিফ এসেছে, সাহায্য এসেছে কিন্তু কখনোই জায়গামতো পৌঁছায়নি। আগেই অন্যরা লুটেপুটে খেয়ে ফেলেছে।'

টুটুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমাদের দেশে ভালো মানুষ নাই আম্মু?'

'আছে। কিন্তু তারা তো আর রাজনীতি করে না। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে, ভালো মানুষেরা যখনই রাজনীতি করতে গিয়েছে হয় তাদের মেরে ফেলেছে, না হয় রাজনীতি করতে দেয়নি।'

রুনুও এবারে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। আম্মা বললেন, 'তাড়াতাড়ি খেতে আয়, একটু পরেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে।'

সূর্য ঢলে পড়ছে, একটু পরেই যখন সূর্য ডুবে যাবে তখন সারা দেশ অন্ধকারে ডুবে যাবে। দেশের প্রায় পুরো ইলেকট্রিসিটিটাই আসত গ্যাস জেনারেটর দিয়ে। ২০ বছর আগে যখন দেশের গ্যাস ফুরিয়ে গেল তখন একটি একটি করে সবগুলো জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেল। এখন এই দেশে আর কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই, অল্প যেটুকু তৈরি হয় দেশের বড়লোকেরা, মন্ত্রীরা, গডফাদাররা, বিদেশী কূটনীতিকরা ব্যবহার করে।

টুটুল আর রুনু খেতে বসল। অল্প কয়টি ভাত, কিছু আলু সেদ্ধ, একটি ডিম দুই ভাগ করে দুইজন। সঙ্গে কিছু মটরশুঁটি। টুটুল জিজ্ঞেস করল, 'আম্মু তুমি খাবে না?'

'তোরা খা, আমার খিদে নেই।'

'তুমি তো কালকেও ঠিক করে খাওনি, আম্মু।'

'আমরা তো বড় হয়ে গেছি তাই আমাদের এত খিদে পায় না। তোরা তো বাড়ন্ত তাই তোদের ভালো করে খাওয়া দরকার।'

রুনু বলল, 'ও।' ছোট বলে সে বুঝতে পারল না যে, আসলে খাবার নেই বলে আম্মু খাচ্ছেন না। টুটুল তার খাবার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যখন ছোট ছিলে তখন কী বাংলাদেশে খাবার ছিল?'

অতীতের কথা স্মরণ করে আম্মার চোখ হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটু হেসে বললেন, 'এক সময় বাংলাদেশ খাবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। ইলেকট্রিসিটি দিয়ে পানির পাম্প আর সার কারখানা চলত। সেই পানি আর সার দিয়ে চাষাবাদ হতো। এখন গ্যাস নেই, তাই ইলেকট্রিসিটি নেই। ইলেকট্রিসিটি নেই তাই পানি নেই। পানি নেই তাই চাষাবাদ নেই। চাষাবাদ নেই তাই খাবার নেই। প্রথম যখন দুর্ভিক্ষ হলো-' আম্মা হঠাৎ করে থেমে গেলেন।

টুটুল জিজ্ঞেস করল, 'তখন কী হয়েছিল আম্মু?'

আম্মা হাত নেড়ে বললেন, 'থাক সেসব কথা শুনে লাভ নেই।'

'কেন আম্মু? বলো না শুনি।'

আম্মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেশের গ্যাস যখন ফুরিয়ে গেল তখন হঠাৎ করে চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেল, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, খাবার নেই, চাকরি নেই, গায়ে কাপড় নেই, থাকার জায়গা নেই- হঠাৎ করে পুরো দেশ যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দেশের মনে হয় অর্ধেক লোক না খেয়ে মরে গেল। পথে-ঘাটে মানুষ মরে থাকত- কী ভয়ঙ্কর অবস্থা।'

রুনু খাওয়া বন্ধ করে তার মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তারপর কী হলো আম্মু?'

'দেশে তখন বড় বড় দাঙ্গা হলো। সরকার অচল হয়ে পড়ল। ১৫ কোটি ক্ষুধার্ত মানুষকে নিয়ে দেশ চালানো অসম্ভব একটা ব্যাপার। একের পর এক সরকার আসে আর যায়; কেউ দেশকে টেনে নিতে পারে না। চাষাবাদ নেই, কল-কারখানা নেই, স্কুল-কলেজ নেই- কেমন করে দেশ চলবে? তখন মিলিটারিরা এল শাসন করতে। তারা এসে দেশের কিছু মন্ত্রী, কিছু বড়লোক, কিছু বিদেশীদের প্রটেকশন দিয়ে পুরো দেশের কথা ভুলে গেল। এখন পুরো দেশ চলছে নিজের মতো। কোনো নিয়মকানুন নেই, কোনো আইন নেই। এক একটা এলাকা চালায় এক একটা মাস্তান। এক একটা গডফাদার।'

টুটুল জিজ্ঞেস করল, 'আমরা যখন বড় হব তখন কী হবে আম্মু?'

আম্মার খুব ইচ্ছে করল একটি আশার কথা বলবেন, একটি সাহসের কথা বলবেন, কিন্তু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। প্রায় ৩০ বছর আগে যখন নতুন সহস্রাব্দ শুরু হলো তখন সারা পৃথিবীতে তথ্যপ্রযুক্তির একটি জোয়ার এসেছিল। সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরাও কত আশা আর স্বপ্ন নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে শুরু করল। যখন দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ডটা পুরোপুরি ভেঙে গেল তখন পড়াশোনার ব্যাপারটি ধীরে ধীরে উঠে গেল। যারা বড়লোক শুধু তারা পড়াশোনা করতে পারে, যারা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত তাদের পড়াশোনার সুযোগও আস্তে আস্তে পুরোপুরি উঠে গেল। সরকার দেশের মানুষকে খেতে দিতে পারে না, কেমন করে পড়াশোনা করাবে? শুধু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে লাখ লাখ টাকা দিয়ে বড়লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ে, পড়াশোনা শেষ করে তারা দেশ ছেড়ে চলে যায়। এখন বাংলাদেশ হচ্ছে আশাহীন, ভরসাহীন, স্বপ্নহীন মানুষের দেশ।

টুটুল আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হবে আমাদের আম্মু?'

'ভালো করে পড়াশোনা কর বাবা, হয়তো কোনো ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পাবি। হয়তো পড়াশোনা শেষ করে তোর বাবার মতো অন্য কোনো দেশে কাজ খুঁজে পাবি।'

টুটুল স্থির চোখে তার আম্মার দিকে তাকিয়ে রইল। সূর্য ডুবে-যাওয়ার পর সবাই মিলে তাদের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে শুরু করল। জানালা বন্ধ করার

আগে আম্মা একবার বাইরে তাকালেন। মানুষজন দ্রুত ঘরে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। যতদূর দেখা যায় বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি। কোথাও একটি গাছ নেই। সব গাছ কেটে জ্বালিয়ে নেওয়া হয়েছে। আম্মা অনেকদিন ঘর থেকে বের হন না, সেদিন শহরের মাঝে গিয়েছিলেন। রাস্তার মোড়ে একটা খবরের কাগজ লাগিয়ে রেখেছে। অনেক মানুষের সঙ্গে আম্মাও সেটি খানিকক্ষণ পড়লেন। সারা বাংলাদেশে নাকি কোথাও কোনো গাছ নেই। সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। পুরো দেশ নাকি, একটি মরুভূমির মতো। আম্মার মনে পড়ল মাত্র ৩০ বছর আগেও এই দেশে কত গাছ ছিল, বর্ষার শুরুতে যখন সব গাছের পাতা ধুয়ে মুছে ঘন সবুজ হয়ে উঠত তখন দেখতে কী সুন্দরই না লাগত! আম্মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জানালা বন্ধ করে দিলেন। একটু পরেই সারা দেশ গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টুটুল আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কী একটা মনে পড়ায় সে উঠে বসল। সে বলল, 'আম্মু, তুমি ঘুমিয়ে গেছো?'

'না, বাবা। কী হয়েছে?'

'যে মন্ত্রীরা আমাদের দেশের গ্যাস বিক্রি করে দিয়ে দেশের এরকম অবস্থা করেছে, তাদের ছেলেমেয়ে ছিল না?'

'ছিল।'

'তারা এখন কেমন আছে?'

আম্মা আনন্দহীন এক ধরনের হাসি হাসলেন, হেসে বললেন, 'তারা কী এই দেশে আছে নাকি বোকা ছেলে? গ্যাস বিক্রির টাকা নিয়ে তখনই তারা সবাই আমেরিকা চলে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা খুব ভালো আছে সেই দেশে।'

এক ধরনের অসহায় আক্রোশ নিয়ে ১২ বছরের একটি কিশোর অন্ধকার ঘরে নিদ্রাহীন চোখে বসে থাকে। ভোরবেলা সূর্য ওঠার পর এই অন্ধকার কেটে যাবে কিন্তু তার জীবনের অন্ধকার কি কাটবে কখনো?

* * * *

এটি একটি কাল্পনিক গল্প এবং আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, এটি কখনোই সত্যি গল্প হবে না– এটি কাল্পনিকই থেকে যাবে। এ দেশের গ্যাস কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এর মালিক হচ্ছে বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষ। কিছু বিদেশী তেল কোম্পানির লোভের মূল্য জোগানোর জন্য এই দেশে সরকার নিশ্চয়ই দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেবে না।

ভবিষ্যতের টুটুল আর রুনুদের জীবন নিশ্চয়ই আমাদের জীবন থেকে শতগুণ আনন্দময় হবে, সহস্রগুণ স্বপ্নময় হবে এবং সেটি করে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার।

প্রথম আলো
২৬ শে ডিসেম্বর ২০০১